# তেইশ বছর আগে পরে

## মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তেইশ বছর আগে পরে প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

# প্রথম অধ্যায়

তেইশ বছর আগে ছাত্রজীবনে একটি করুণ কাহিনি রচনা করেছিলাম। 'অতসী মামি' নিয়ে গল্প লেখা শুরু করার পর এটি আমার দ্বিতীয় লেখা। কাহিনিটি প্রকাশিত হয়েছিল বিচিত্রায়। সম্পাদকেরা নতুন লেখকের রসালো গল্পও স্বেচ্ছায় খুশি হয়ে ছাপেন বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে এটা প্রমাণ করার জন্য লেখা অতসী মামি বার হবার পর বিচিত্রা-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় উপেনদার তাগিদ আর উৎসাহেই দু-নম্বর কাহিনিটি লেখা হয়। অতসী মামিও করুণ রসে ফেনানো কাহিনি। পরে এই কাহিনিটির নাম দিয়ে গল্প সংকলন বার করতে আমার দ্বিধা হয়নি। কারণ, বস যাই থাক, যতই রোমান্টিক হোক, ওটা ছিল সম্পূর্ণ গল্প। ওই কাহিনি-সংকলনের মধ্যে অতসী মামি-র পরেই ব্যথার পূজা-কে ঠাঁই দেবার লোভ সামলাতে নিজের সঙ্গে কী লড়াইটাই করতে হয়েছিল অনভিজ্ঞ তরুণ লেখক আমাকে !

এ তো গল্প নয়। এ যে অসম্পূর্ণ কাহিনি। মাসিকের পাতায় জীবনের খণ্ডিত একপেশে অসম্পূর্ণ কাহিনি ছাপানোর ছেলেমানুষির জের তো গল্প সংকলনে টানা চলে না !

কাহিনিটিকে সম্পূর্ণতা দেবার দায়িত্বই কেবল নয়, বাস্তবকে ফাঁকি দিয়ে আর সত্যকে আড়ালে রেখে কীভাবে ফেনিল ভাবালুতার গল্প লেখা যায় সেটা দেখিয়ে দিয়ে সাহিত্যে ব্যথার পূজা-র নজির বাতিল করার দায়িত্বও আজ তেইশ বছর পরে পালন করছি।

দু-একটি সামান্য ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে বিচিত্রায় প্রকাশিত অসম্পূর্ণ কাহিনিটি অবিকল তুলে দিয়ে আমাদের উপন্যাস আরম্ভ করা যাক :

## ১

বন্ধুর জীবনের কাহিনি।

যে বয়সে যৌবন বিদায় নেয় না সেই বয়সে বন্ধু পৃথিবী হতে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। তার ব্যথার পূজা সমাপ্ত হয়েছে কি হয়নি সে প্রশ্নের জবাব আজ আর মিলবে না। জীবনের ওপারে, যেখানে দুঃখলেশহীন অফুরন্ত আনন্দ-উৎসবের অপরিম্লান হাসিই শুধু ব্যাপ্ত হয়ে আছে শুনতে পাই, সেখানে গিয়ে যদি তার দেখা পাই, তবে হয়তো এ প্রশ্নের জবাব পাব।

এক-একটি অভিশপ্ত জীবনে এক-একটি বিশিষ্ট ক্ষণে মরণের প্রলোভন কী দুর্জয় হয়েই না দেখা দেয়। বেদনায় বিকল প্রাণ দেহের বন্ধন কাটিয়ে দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। জীবন হয় রসহীন, তিক্ত ; মরণ হয় মধুর। বন্ধুর জীবনে তেমনি একটি ক্ষণ এসেছিল। কিন্তু ইহজগতে থেকেই দিনের পর দিন স্তূপীকৃত হয়ে ওঠা বেদনার আগুনে নিজেকে শুদ্ধ করবার আশায় মৃত্যুর সেই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা সে জয় করেছিল। এপারের ব্যর্থ সাধনায় ওপারের জীবনকে সার্থক করে তুলবার জন্য সে বেঁচেছিল বলেই আজ এই কল্পনাতীত বেদনার্ত কাহিনি বলবার সুযোগ আমি পেয়েছি ; নাহলে কোথায় কবে এক দীর্ণ আত্মা অস্বাভাবিক উপায়ে স্বাভাবিককে বরণ করে নিত, নিখিল অন্তরে যার আনাগোনা তিনি ছাড়া এতটুকু আভাসও হয়তো কেউ পেত না।

তার তপস্যার, তার সুতীব্র সাধনার সমাপ্তি হয়ে গেছে। গেছে যাক। চোখে আমার জল আসে আসুক। বিরাম নেই, বিচ্যুতি নেই, ক্ষণিকের বিস্মৃতি নেই, সুদীর্ঘ তেরো বছরের প্রত্যেকটি অনুপল সে জ্বলেছে। অতল বিস্মৃতির অন্ধকারে তার বেদনা ঢাকা পড়ুক স্বপ্নহীন চিরনিদ্রার কোলে তার দীর্ণ

হৃদয় অনন্তকাল ঘুমিয়ে থাকুক। তার কথা ভেবে চোখের জল ফেলি, কিন্তু এ ছাড়া আমার অন্য কামনা সে বেঁচে থাকতেও ছিল না।

উচ্ছ্বাস থাক, ভালো লাগে না। বেদনার সমুদ্রের পরিচয় দিতে খানিকটা ফেনা তুলে দেখিয়ে লাভ নেই, লজ্জাও করে।

নাম জগদীশ—। ঢাকা শহরে আমাদের ছিল পাশাপাশি বাড়ি। কবে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়েছিল, ভুলে গেছি। তার বাবা ছিলেন টাকার কুমির না কী বলে তাই। তাদের রাজপ্রাসাদের পাশে আমাদের বাড়িটা নিতান্ত খাপছাড়া দেখাত নিশ্চয়, কিন্তু কেন যে এই বাড়িটা জগদীশের ভালো লেগেছিল সেই জানে। জন্মেই মা-কে হারিয়েছিল, আমার মা-র কাছেই তার দিন এবং রাত্রির বেশিরভাগ সময় কাটত। বাবা তার ছিলেন ভারী ভালো মানুষ। টাকার গদিতে বসেও যারা তুলোর গদি ছাড়া বসবার জন্য কিছু পায় না তাদের ছোটো মনে করতেন না। জগদীশ যে আমার সঙ্গে মিশত তাতে তাঁকে খুশি হতেই দেখেছি।

তেইশ বছর বয়স পর্যন্ত আমাদের বন্ধুত্ব জমাট বাঁধল, তারপর হল ছাড়াছাড়ি। একসঙ্গে এম এ পাস করে আমি চাকরি নিলাম এবং একটি ছোট্ট মেয়ের জীবনের সঙ্গে বাকি জীবনটা গেঁথে ফেললাম। জগদীশ সে সব কিছু করল না, বাপের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা নিয়ে মস্ত জাহাজে চেপে বসল।

মনে পড়ে প্রশ্ন করেছিলাম, কী পড়তে যাচ্ছিস রে ?

ছোঃ ! পড়তে নয়, বেড়াতে। যাবি ?

বিয়ে করে ফেললাম যে !

ওই তো দোষ ! করলি কেন ? বউদি অভিশাপ দেবে তাই, নইলে তোকে কি ফেলে যেতাম রে !

পূর্ব হতেই স্থির ছিল বিদায়ের সময় কেউ মুখভাব করতে পারব না। হাসিমুখেই কথা বলছিল, কিন্তু যখন আমার নেমে আসার সময় হল চকিতে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। আমার গলা জড়িয়ে ধরে তেইশ বছরের বন্ধু আমার কাঁদল !

যাবার সময় কাঁদল কিন্তু দু-বছরে চিঠি লিখল মোটে তিনখানা ! জগদীশকে চিনতাম, চিঠিপত্র লেখা তার ধাতসই নয়।

জগদীশের বাবা ডেকে পাঠালেন।

চিঠিপত্র পাও ?

আজ্ঞে না। জানেন তো চিঠি লিখতে ওর কত আলস্য।

ভাবনা হচ্ছে যে হে ! যে ছেলে !

বললাম, আজ্ঞে, এমনিই তো চিঠিপত্র লেখে না, তার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে !

একটা টেলিগ্রাম করব কি না ভাবছি। কোথায় আছে তাও কী ঠিক জানি ছাই ! চরকির মতো ঘুরছেই তো খালি।

বৃদ্ধ একটা নিশ্বাস ফেললেন।

বছর চারেক পরে জগদীশ দেশে ফিরল। ফিরবার ইচ্ছা বিশেষ ছিল না, বাপের কঠিন অসুখের খবর পেয়ে বাধ্য হয়েছে ফিরতে।

তার আসার দিন পাঁচেক আগেই তার বাবা মারা গেছেন। শ্রাদ্ধের পর মাস তিনেক বাড়ি থেকে কলকাতায় চলে গেল। তারপর দশ বছর আর সাড়াশব্দ নেই। মাঝখানে কেবল খবর শুনলাম, সে তার সর্বস্ব দান করেছে। অদ্ভুত দান ! বাড়িঘর বিষয়-সম্পত্তি যা ছিল সব বিক্রি করে একটা ফান্ড করে দিয়েছে বাংলা থেকে প্রতি বৎসর দুটি মেয়েকে মিউজিক শিখবার জন্য বিলাতে পাঠাতে।

যে বছর বাঙালি মেয়ে পাওয়া যাবে না সে বছর ভারতবর্ষের যে কোনো প্রদেশের মেয়েরা ওই বৃত্তি পেতে পারবে।

কিছুকাল পরে বাঁচি থেকে একটি পোস্টকার্ড বন্ধুর বার্তা বহন করে আনল। জরুরি দরকার কিছু টাকা চেয়েছে।

কিছুই মাথায় ঢুকল না। বাচি শহর নয়, চিঠি লিখেছে একটা কটমটে নামযুক্ত গ্রাম থেকে। বাঁচির অভ্যন্তরে এক বিকট নামের এবং খুব সম্ভব নামের চেয়েও বিকটতর গ্রামে আমার বাল্যবন্ধুটি কী করছে এতকাল পরে জরুরি প্রয়োজন জানিয়ে সামান্য ক টা টাকা বা চেয়ে পাঠাল কেন, অনেক ভেবেও প্রশ্ন দুটির জবাব পেলাম না।

সবস্ব দান করার খবরটা যদি সত্যও হয় বাপের বাশি বাশি টাকা থেকে নিজের দরকার মেটাবার মতো টাকাও কি সে রাখেনি ?

সেইদিন রাত্রের এক্সপ্রেসে রওনা হলাম। বাচিতে এক বন্ধু থাকতেন, তিনিই খবর নিয়ে জানালেন গ্রামটি হুড্রু ফলস যেতে মোটরের শেষ স্টপেজ। এই গ্রামের পর মাইল দেড়েক হেটে ফলসে যেতে হয়।

তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি নিয়ে বার হলাম। ষোলো মাইল ভালো এবং মাইল আষ্টেক খারাপ রাস্তা পার হয়ে গন্তব্যস্থানে যখন পৌঁছলাম তখন চারটে বাজে। শীতের বেলা এরই মধ্যে রোদের তেজ কমে গেছে।

যেখানে মোটর থামল তার হাত কয়েক দূরে খড়ের ছাওয়া কতগুলি মাটির ঘর। মোটরের শব্দে কোমরে তিন হাত চটের মতো মোটা কাপড় জড়ানো জন পাঁচেক লোক ছুটে এল। নিজের একান্ত আধুনিকত্ব নিয়ে প্রকৃতির একেবারে অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করে মোটরটি বোধ হয় লজ্জিত হয়ে পড়েছিল, ড্রাইভারের ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র নিঃশব্দ হয়ে গেল। আমার মনে হল যে সভ্যতা ও আধুনিকতা চব্বিশ মাইল পিছনে ফেলে এসেছি তারই একটা অস্ফুট আওয়াজ কানে আসছিল হঠাৎ সেটিও বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ও তো গেল কবিত্বের দিক। জগদীশ কি সত্যি এইখানে বাসা বেঁধেছে ? ঠাট্টা করেনি তো ? দশ বছরের নীরবতার পর এমনি একটা পরিহাস করবে সেটাই বা কেমন কথা !

একটি লোককে কাছে ডেকে প্রশ্ন করলাম, এখানে এক বাঙালিবাবু আছে রে ?

বংগালি বাবা ? হ ।

বাবু নয়, বাবা ! সন্ন্যাসী হয়ে গেছে নাকি ?

কোথায় থাকেন ? ঘর চিনিস ?

কুটিরগুলির পিছনে আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে লোকটা সংকেত করল।

তাকেই সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হলাম। আনাচকানাচ দিয়ে খানপাঁচেক ঘর পার হয়ে দেখা গেল অন্য কুটির থেকে একটু তফাতে একখানা ঘর দাড়িয়ে আছে। সামনে গিয়ে ডাকলাম, জগদীশ ?

জগদীশ ভেতরে ছিল বাইরে এসে চমকে উঠল। এতদূরে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি এ কথা যেন কোনোমতে সে বিশ্বাস করতে পারছে না এমনিভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

জগদীশই বটে। মানুষ বদলায়, তার নাম বদলায় না নইলে জগদীশ বলে এর পরিচয় দিতে বাধত। চার বছর ইউরোপ বাসের পর দামি বিলাতি পোশাক পরা যে লোকটি ঠোঁটের এক কোণ দিয়ে সিগারেট চেপে ধরে অন্য কোণে সাহেবি হাসি ফুটিয়ে সজোরে আমার হাত ধরে নাড়া দিয়ে প্রীতি জানিয়েছিল, সে যদি জগদীশ, এই ময়লা চটে কোমর থেকে হাঁটু অবধি ঢেকে, খালি গায়ে খালি

পায়ে, একমাথা রুক্ষ চুল আর জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ দেহ নিয়ে যে লোকটি আমার সামনে এসে দাঁড়াল তাকে জগদীশ বলব কোন মুখে ?

নীচে নেমে এসে আমার দুটি হাত চেপে ধরে বলল, স্বপ্নেও ভাবিনি তুই আসবি ভাই ! এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। ভেতরে আয়।

সে না হয় যাচ্ছি, কিন্তু এ কী কাণ্ড বল তো ? এখানে কী করছিস ? এমন চেহারা হয়েছে কেন ? কতদিন আছিস এখানে ?

ম্লানমুখে হাসি ফুটিয়ে বললে, সব বলব, ভেতরে আয়, পাতার কুটিরের প্রাসাদে চাটাইয়ের সিংহাসনে বসিয়ে আজ তোর অভ্যর্থনা করব। এতদিনে আমায় ভুলিসনি ! এত দূরে ছুটে এসেছিস বন্ধুকে দেখতে !

হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। ছোটো ঘর, হাত দশেক লম্বা, হাত আষ্টেক চওড়া। এককোণে কয়েকটা হাঁড়ি-কলসি। একপাশে উনুন, তার কাছে মাটির বেদির ওপর কালিমাখা গুটি-দুই হাঁড়ি। একদিকে খাওয়ার জলের কলসির কাছে একটা অ্যালুমিনিয়ামের গেলাস ছাড়া সমস্ত ঘরে ধাতব বাসন আর চোখে পড়ল না। অন্য পাশে খড়ের গদিতে চাটাই বিছানো—জগদীশের রাজশয্যা ! বালিশ নেই, বাড়তি এবং ছেঁড়া কাপড় মাথার কাছে পুঁটলি করা আছে।

এমনি সব আসবাবের মাঝে নিতান্ত খাপছাড়া একটি অপূর্ব আসবাব চোখে পড়ল। বিছানার পাশে, সিল্কের রুমাল ঢাকা দামি মেহগনি কাঠের ছোট্ট একটি জলচৌকি। তার ওপরে একটি চওড়া পাড় শাড়ি। শাড়িটির জায়গায় জায়গায় লালচে দাগ, বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

ওটা কী রে ?

যেন নিতান্ত বিস্মিত হয়েছে এমনিভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে ব্যথিত স্বরে জগদীশ বললে, অমন করে বলছিস যে ? বুঝতে পারছিস না ? আমার স্ত্রীর কাপড়।

স্ত্রীর কাপড় ! জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাইলাম।

স্বপ্নের জড়তা কাটাতে মানুষ যেমন নিজের মাথায় ঝাঁকুনি দেয় তেমনিভাবে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে জগদীশ যেন নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে নিল। লজ্জিত কণ্ঠে বলল, তুই যে জানিস না খেয়াল ছিল না ভাই। সব বলব, তখন বুঝবি। তোর কাছে পয়সা আছে ? ব্যাগটা বার করে তার হাতে দিলাম। একটা সিকি বার করে জগদীশ ডাকল, জিরাই।

দরজার কাছে পাঁচ-সাতজন লোক বসেছিল, একজন সাড়া দিল, আজ্ঞে বাবা ?

কিছু দুধ আর কলা জোগাড় করে নিয়ে আসতে হবে যে বাবা !

আমি হাঁ করে জগদীশের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। এ কী কণ্ঠস্বর ! এ কী বলবার ভঙ্গি ! ঠিক যেন প্রবীণা গৃহিণী। পরের ছেলেকে কাজে পাঠাবার সময় এমনি অননুকরণীয় কণ্ঠে তাঁরাই অনুরোধ জানান বটে ! সংসারের ছোটোবড়ো ঝঞ্ঝাটে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে যারা, অথচ যাদের জীবনের সমস্তটুকুই নিহিত আছে ওই ঝঞ্ঝাট ভোগ করার মাঝে, তাদেরই শান্তি আর ক্লান্তির ছায়াপাতে অপূর্ব মুখচ্ছবির এ কী অবিকল প্রতিলিপি আমার এই বাল্যবন্ধুটির মুখে ফুটে উঠল !

ক্ষুধায় নাড়ি জ্বলছিল, দুধকলা আর মোটা চিড়ার ফলার অমৃতের মতো লাগল। বাইরে ছোটো বারান্দাব মতো ছিল, জলযোগের পর সেইখানে গিয়ে বসলাম। তারপর দুজনের যে সাধারণ খবরাখবর আদান-প্রদান এবং সুখ-দুঃখের গল্প চলল তার সঙ্গে এ কাহিনির সম্বন্ধ নেই।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। শীতের সন্ধ্যা, তবু আমার মনে হল এ সন্ধ্যারও যেন একটা নিজস্ব মাধুর্য আছে। আর সেই মাধুর্যের খোঁজ মেলে এমনি এক নির্জন, নিঃশব্দ সভ্যতার বাঁধন-খসানো অখ্যাতনামা

গ্রামে পাতার কুটিরে ছেলেবেলার বন্ধুর পাশে বসে। যতদূর দৃষ্টি চলে,—অনন্ত বৃক্ষশ্রেণি। সবুজ আর সবুজ। সেই সবুজ গাঢ় হতে হতে সবুজের সীমা ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে কালো হয়ে ওঠে।

জগদীশ হঠাৎ বলে, শহরে ফিরে যাবি তো ?

এই চব্বিশ মাইল ফিরে যাব ?

কিন্তু এখানে কি রাত কাটাতে পারবি ভাই, ভারী কষ্ট হবে ?

বললাম, তুই যদি এতকাল এখানে কাটাতে পেরে থাকিস, একটা রাত কাটাবার ক্ষমতা আমার হবে।

জগদীশ একটু ভেবে বললে, আমায় কিন্তু জিরাইয়ের মেয়ে রেঁধে দিয়ে যায়, খাবি তো ?

তুই খাস, আমি খাব না ?

জগদীশের সংকোচ তবু গেল না, ইতস্তত করে বললে, বিছানা নেই, কিছু নেই—

বাধা দিয়ে বললাম, নেই তো নেই ! এই চাটাইয়ে পাশাপাশি শুয়ে দুই বন্ধুতে গল্প করেই রাত কাটিয়ে দেব।

খানিক পরে জিরাইয়ের মেয়ে হাজির হল। আঁটোসাঁটো গড়ন, বিধাতা গায়ের রংয়ের দোষ পুষিয়েছেন অতিরিক্ত যৌবন দিয়ে। শরমকুণ্ঠিত পদে জল আনতে চলে গেল। জল এনে মশলা বেটে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে অস্ফুটস্বরে কী বলল, বুঝতেই পারলাম না।

জগদীশ বললে, আচ্ছা যা। মাছ পাস তো আনিস।

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

জগদীশ বললে, আমি হলাম জিরাইয়ের বাবা, সেই সূত্রে ওর দাদামশাই। তোকে দেখে আজ মুখ খুলল না অন্য দিন কত গল্পই করে। স্বামীটা পাঁড় মাতাল, দিনরাত তাড়ি গেলে আর ওকে ধরে মারে। কিন্তু মেয়েটা সেই মাতালটাকেই যে কী ভালোবাসে ভাবলে অবাক হয়ে যাই। জাত-অজাত মানে না, ভদ্র-অভদ্র জানে না, মার্জিত-অমার্জিত মনের খবর রাখে না, ভালোবাসা বিধাতার কী অপূর্ব সৃষ্টি তাই ভাবি। অমন চেহারা, মাতালটাকে ছেড়ে যে কোনো ভালো লোককে বিয়ে করতে পাবে, ওদের সমাজে তাতে দোষ নেই। সবাই উপদেশও দেয় তাই। ও শুনে ঘাড় নেড়ে বলে, কবব। কিন্তু করে না। আমি একবার বলেছিলাম, জবাব দিয়েছিল, কী করব ভাইয়া, ওকে ছাড়তে মন কাঁদে ! আশ্চর্য !—জগদীশ একটা নিশ্বাস ফেলল।

এখানে কেন সে এভাবে আছে এ প্রশ্নের জবাবে সে বলল, আজ নয় ভাই, কাল সকালে বলব—দিনের বেলা।

চাটাইয়ে পাশাপাশি শুয়ে গল্প করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। জলচৌকিটির সামনে হাঁটু গেড়ে নিষ্পন্দ হয়ে জগদীশ বসে আছে। তার সমস্ত মুখ আমার নজরে পড়ছে না, যেটুকু পড়ল তাতে আমার বুকের ভেতর টনটন করে উঠল। একবার জগদীশের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নত করে সে শাড়িটিকে চুম্বন করল। সে কী চুম্বন ! মনে হল শাড়িটির ভাঁজে ভাঁজে, প্রত্যেকটি সুতার পাকে পাকে সুধা সঞ্চিত হয়ে আছে, অধরের স্পর্শ দিয়ে অনন্তকাল জগদীশ সে সুধা পান করে যাবে। কতক্ষণ পরে হিসাব ছিল না, জগদীশ মাথা তুলল। মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইতেই দেখলাম তার দুচোখ জলে ভরে গেছে। তাড়াতাড়ি চোখ বুজে নিঃশব্দে পড়ে রইলাম। তার বুক ভাঙা দুঃখের এমন অপূর্ব প্রকাশের সাক্ষী হয়ে যে রইলাম, সে কথা গোপনই থাক।

নিজে থেকে যদি বলে, শুনব। যার যা বেদনার সম্পদ সে তার গোপন থাকাই শ্রেয়।

পরদিন অতি ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। জীবনের এতগুলি বছর কাটিয়ে দেবার পর সেইদিন প্রথম অনুভব করলাম পাখির ডাকে ঘুমভাঙা জিনিসটা সত্যি সত্যি কী। কিচিরমিচির প্রলাপ, কিন্তু

কী মিষ্টি ! যেন প্রভাতকে বরণ করে নেবার বরণডালায় লক্ষ প্রাণীর প্রকাশব্যাকুল আনন্দ-প্রদীপের শঙ্খিত শিখা !

ড্রাইভার এসে সেলাম জানিয়ে বললে, কখন ফিরবেন বাবু ?

বাহুল্য প্রশ্ন। আসল কথা, ভালো রকম সেলামির ব্যবস্থা না করলে সে আর এই জঙ্গলে পড়ে থাকতে রাজি নয়। তাই করা গেল।

বেলা বাড়ল। জগদীশকে বললাম, ফলস দেখে আসি চল।

জগদীশ ঘাড় নেড়ে বললে, এখন নয়, বিকেলে।

প্রায় তিনটের সময় জগদীশ আমাকে ফলস দেখাতে নিয়ে চলল। উঁচুনিচু বাঁকাপথ। কোথাও সর্ষেখেতের বুক ভেদ করে গেছে, কোথাও ছোটোবড়ো পাথরের টুকরো দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলেছে। অর্ধেক পথে ছোটো একটি নদী পড়ল। আসলে ঝরনাই ; এরা বলে নদী। হেঁটেই পার হওয়া যায়। গোটা পনেরো মহিষ স্নান করছিল, সেই মহিষবাহিনীর সেনাপতিকে দেখে আমি হেসে ফেললাম। বছর পাঁচেকের একটা উলঙ্গ ছেলে সকলের বড়ো মহিষটার পিঠে গদিয়ান হয়ে তারস্বরে আদেশ জারি করছে। এই ধুমসো কালো দৈত্যগুলিকে আগলাবার ভার পড়েছে এই পুঁচকে মানব সন্তানটির ওপরে ! হাসির কথাই !

জলপ্রপাতের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি কানে আসতে বুঝতে পারলাম, কাছে এসেছি। আরও কিছুদূর অগ্রসর হতে শব্দ বাড়ল এবং দেখা গেল পাথরে ঠাসা নদীগর্ভে জলস্রোত বয়ে চলেছে। শীতকাল, জল বেশি নেই।

জগদীশ আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওই পাথরের ও পাশে চল। সেখানে চারশো ফিট নীচে এই জলের ধারা আছড়ে পড়ছে। পাথরে পাথরে পা দিয়ে প্রপাতের মুখের কাছে এসে দাঁড়ালাম।

নর্মদার বিপুল জলরাশির বিপুলতম পতনের সৌন্দর্য দেখে এসেছি। আজ বুঝলাম বিপুলতাই সব নয়, সৌন্দর্য ক্ষুদ্র বৃহতের অপেক্ষা রাখে না। নর্মদা সুন্দর, কিন্তু এই যে গুচ্ছ গুচ্ছ সৌন্দর্যের ফুল ফুটে আছে এখানে শ্যামসুন্দর বৃপ তরুর শাখায়, এরও তো তুলনা বোধ হয় নেই !

চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল, ওস্তাদ শিল্পী বটে ! এ যেন ছবির মাঝে চঞ্চল জীবনের প্রকাশ। পাথর নড়ে না, পাহাড় নড়ে না, চতুর্দিকের তরুশ্রেণির শাখায় বাতাসের বেগে যে দোলা জাগে তাও চোখে ধরা পড়ে না, সব যেন তুলি দিয়ে আঁকা নিশ্চল ছবি। তার মাঝে এই পাহাড়ি ঝরনা জীবন্ত, এর প্রাণ আছে, এ চঞ্চল। প্রতি মুহূর্তে বিরামহীন গতিতে চারশো ফিট নীচে লাফিয়ে পড়ে নিজেকে চূর্ণ করে শুভ্র কুহেলির জাল বুনে সূর্যকিরণের রশ্মি-বিশ্লেষণে অপূর্ব শোভা ফুটিয়ে তুলছে !

পাশ দিয়ে ঘুরে নীচে নামলাম। নীচে থেকে সবটুকু জলধারা দৃষ্টিগোচর হয়। মুগ্ধ হয়ে দেখলাম। সূক্ষ্ম জলকণা ঝরনার প্রীতিস্পর্শ জানিয়ে দিল। ওপরে যখন উঠলাম তখন চারটে বেজে গেছে এবং হাঁফ ধরে গেছে।

একপাশে প্রকাণ্ড একটি মসৃণ পাথর পড়েছিল। দেখলেই বোঝা যায় মানুষের হাত পড়েছে। বললাম, আয়, এই পাথরটাতে বসি।

অগ্রসর হতেই জগদীশ আমার হাত চেপে ধরে বললে, না।

চেয়ে দেখি তার মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

হাত ধরে সেই পাথরের পাশে অন্য একটা পাথরে বসিয়ে বললে, বলছি।

সেইখানে প্রপাতের একটানা ছন্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে তার কাহিনি বলে গেল।

২

তেইশ বছর বয়স পর্যন্ত ঘরের কোণে কাটিয়ে যখন বাইরে পা দিলাম তখন এই কথা ভেবে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না যে মানুষ ঘরের কোণটা আঁকড়ে থাকে কী সুখে। কী সে বাইরের রূপ। দেশে দেশে প্রকৃতির নব নব রূপের বিকাশ, দেশে দেশে মানুষের বিভিন্ন নিজস্ব বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা প্রণালি। এই দুয়ে, প্রকৃতি আর মানুষে মিলে বাইরেটাকে কত বড়োই না বাড়িয়েছে। রূপসি ধরণী। বিচিত্রা।

বাবা জানতেন পড়তে গেলাম। ছাই পড়া। আমি তখন মানুষকে পড়ছি। দেড়শো কোটি নরনারীকে অনেকগুলি পরিচ্ছেদে ভাগ করে ভগবান যে বইটি লিখেছেন সেই বইখানা পড়ছি। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ আমায় কী শেখাবে?

মুক্তির উন্মাদনা, বাধন ছেঁড়ার দৌড়ে চলা, সে যে কী জিনিস বলবার ভাষা নেই। কিন্তু কী আশ্চর্য এই সৃষ্টি। মুক্তির আনন্দকে নিবিড়তর করে তুলবার জন্য চারিদিকে কত বন্ধনই ছড়িয়ে আছে।

নারী।

কী অদ্ভুত সৃষ্টি বিধাতার। পথ চলতে দেবে না। মনের আনন্দে জীবনের পথে গান গেয়ে চলেছ শ্রান্তি ক্লান্তির লেশমাত্র নেই, কণ্ঠে অপূর্ব করুণা ফুটিয়ে বলবে, পথিক, বড়ো শ্রান্ত তুমি, বিশ্রাম চাই না? এসো তোমায় নতুন পাথেয় দেব। দেয়। কিন্তু দেবার ফাঁকে ফাঁকে পায়ে শিকল বাঁধে।

লিওনবার্ড গণ্ডাচারেক আত্মীয়বন্ধু বললে, চলো চার্চে।

ভারতবর্ষের রাজাদের ওপর তাদের একটা বিশ্রী লোভ আছে। লিওনবার্ড হাতে হাজার কয়েক টাকা গুঁজে দিতেই তার আত্মীয়বন্ধুরা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

নোটের তাড়া নিয়ে রুমালে চোখ ঢেকে লিওনবা বললে, বন্ধু, তুমি কী নিষ্ঠুর।

একটা তৃতীয় নেত্র হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করল।

আমি তখন কনস্টান্টিনোপলে। কলেজের আহমেদকে মনে পড়ে? তারই এক খুড়োর বাড়িতে। ইচ্ছা ছিল ভদ্রলোকের বাড়িতে দিন দুই আতিথ্য গ্রহণ করে আফ্রিকাটা ঘুরে আসব। শুনেই খুড়োর মেয়েটি ঠোঁট ওলটালে।

থেকে গেলাম।

দিন কুড়ি পরে খুড়োটি মুখ অন্ধকার করে বললে, সরি। গো। গো আমি নিজেই করতাম, সেইদিনই বাবার অসুখের সংবাদ পেয়েছিলাম।

জগদীশ কতক্ষণ নিঃশব্দ থেকে ধীরে ধীরে বলল, আজ আমার একমাত্র সান্ত্বনা ভাই, আমার কথা তাদের মনে নেই। থাকেও না। তারা আমার যৌবনকে যে জাগরণে জাগিয়েছিল সেই জাগরণই আমার জীবনকে অভিশপ্ত করে দিয়েছে। ওই দুটি নারী যদি প্রথম যৌবনে আমার অন্তরের ব্যাকুল কামনাকে অমন করে উত্তেজিত করে না তুলত তবে হয়তো আজ আমার এমন করে জ্বলতে হত না। তারা আমায় ভুলেছে, তাদের যে ক্ষতি আমি করেছিলাম আমার ক্ষতির কাছে সে ক্ষতি তুচ্ছ হয়ে গেছে। তবু, বিদায় নেবার কালে তাদের অনুচ্চারিত অভিশাপবাণী আজও এক-একসময় আমার নিশ্বাস বন্ধ করে আনে। যাক।

জাহাজেই তাকে দেখি। মন ভারী খারাপ ছিল। ডেকচেয়ারে কাত হয়ে চোখ বুজে নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করছিলাম। চোখ মেলেই দেখলাম, অদূরে রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য তখন পশ্চিমে হেলে

পড়েছে, আর একটু নামলেই সাগরের জলে ডুবে যাবে। পড়ন্ত সূর্যের সোনালি আভা তার মুখে এসে পড়েছে। চোখে আমার কী ভালোই যে লাগল। পলক পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। আমার সমগ্র সত্তা মুগ্ধ হয়ে অপরিচিতা মেয়েটির অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে রইল।

রূপ ? রূপ বইকী ! দৃষ্টিকে সম্মোহিত করে মনের ভেতরে যে জিনিস অমন আলোড়ন জাগিয়ে তুলতে পারে তাই তো রূপ ! সে বছর সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর সেরা রূপসি বলে যে স্বীকৃত হয়েছিল, তাকে দেখে এসেছিলাম ; তার রূপের সঙ্গে এ রূপের এতটুকুও নৈকট্য নেই। সে রূপ দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং চোখের আড়াল হতেই একঘণ্টার ভেতরে ভুলেও গিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন সেই বাঙালি তরুণীর রূপ দেখে মনে হয়েছিল, সে যেন আমারই অন্তরের আনন্দ-প্রদীপের বিচ্ছিন্ন শিখা। এতকাল পরে হঠাৎ দেখা দিয়ে আনন্দের আলোকচ্ছটায় আমার অন্ধকার অন্তর উদ্ভাসিত করে তুলেছে !

সূর্যদেব অস্ত গেলেন।

পশ্চিমের আকাশের গাঢ় রক্তবর্ণের শেষ চিহ্নটুকু ঘনায়মান কালোর মাঝে লুপ্ত হয়ে গেল। জাহাজে আলো জ্বলে উঠল। ধীরে ধীরে সে চলে গেল।

পরদিন আলাপ হল।

প্রথম দিন একাই দেখেছিলাম, পরদিন বিকেলে ডেকে এল এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে। ডেকে আর বাঙালি ছিল না, ভদ্রলোক বারবার আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। নিচু গলায় তরুণীকে কী বলায় স্পষ্ট বোঝা গেল সে আপত্তি করছে। কিন্তু তার আপত্তি করার মর্যাদা না রেখেই ভদ্রলোক আমার সামনে এসে বললেন, নিশ্চয় বাঙালি ?

বাংলাতে বললাম, সন্দেহ আছে !

ভদ্রলোক ভারী খুশি। মাথা দুলিয়ে বললেন, ঠিক, সন্দেহ থাকতেই পারে না, বাঙালির বৈশিষ্ট্য যাবে কোথা। হা হা হা ! সেই জন্যই তো যেচে আলাপ করা। বাঙালি বলে চিনতে কি আর পারিনি ? ও হল যাহোক কিছু বলে কথা আরম্ভ করা। আপনি বিরক্ত হবেন ভেবে আমার মেয়ে তো আপত্তিই করছিল।

বিরক্ত হব ? আপনারা বিরক্ত হবেন ভয়েই তো আমিও যেচে আলাপ করবার চেষ্টা করিনি !

ভদ্রলোক আরও খুশি। হাসতে হাসতে বললেন, ভাগ্যে আপনার বিরক্ত হবার রিস্কটুকু নিয়েছিলাম। নাহলে এক জাহাজে থেকে বাঙালি হয়েও পরস্পরের পরিচিত না হওয়ার কলঙ্ক থেকে যেত।

আমিও হাসলাম।

নাম শুনলাম, অনন্তলাল। কলকাতার অ্যাটর্নি। পরিচয় ছিল না, নাম আগেই শুনেছিলাম।

বাবাকে চিনতেন, বিষয়সূত্রে পরিচয়। বাবার নাম শুনেই আপনি থেকে একেবারে তুমিতে নেমে গেলেন। দশ বছরের ছেলের মতো আমার পিঠ চাপড়ে সস্মিত মুখে বললেন, খাসা লোক তোমার বাবা। তাঁর ছেলেও যে তাঁরই মতো খাসা হবে সন্দেহ নেই।

মনে মনে হাসলাম। না থাকে ভালোই।

মি. সেন দেখলাম মনে-প্রাণে নিতান্তই বাঙালি। সাহেবের সঙ্গে হয়তো সাহেবি এটিকেট বজায় রেখেই আলাপ করেন, আমার সঙ্গে আলাপ করলেন একেবারে বাঙালি প্রথায়। তখন আমি ভীষণ সাহেব, নকল কি না, আসলকে ছাড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে এটিকেটের অভাব থাকলেও রাগ করতে পারলাম না। খুশিই হলাম। চিত্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ওর জন্যই এবার বিলাত-ভ্রমণটা হয়ে গেল। মিউজিক শিখছিল, এইবার ডিগ্রি পেয়েছে। আমার ছেলে শরৎ আইন পড়ছে, দুজনে একসঙ্গেই গিয়েছিল। তার পড়া শেষ হয়নি,

কাজেই মেয়েকে ফিরিয়ে আনবার জন্য নিজেকেই যেতে হল। বিলাতে শিক্ষা পেলে কী হবে, বাঙালির মেয়ে তো। একা ফিরবার সাহসটুকু নেই। চিত্রা সকোপে বলল, মিথ্যে নিন্দে করছ বাবা। আমি তো একাই ফিরব ঠিক করেছিলাম, টেলিগ্রাম করে বারণ করেছিল কে ?

আমার নাম শুনেই চিত্রা যে চমকে উঠেছিল সেটা স্পষ্ট দেখেছিলাম। বিলাতে শিক্ষা পেয়েছে, কিন্তু সে যেন কী রকম নার্ভাস হয়ে পড়ল। কী কারণে জানি না বরাবর দেখেছি মেয়েরা প্রথমটা আমাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। বেশ বুঝি, আমার সঙ্গে পরিচয় না হলেই যেন তারা খুশি হত। একজন তো স্বীকার করেছিল, প্রথম দিন আপনাকে দেখে ভারী ভয় পেয়েছিলাম মি. মিত্র।

সকৌতুকে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন বলো তো ?

কিছুতেই বলবে না, শেষে মুখ লাল করে বলেছিল, কী জানি। আপনার এমন মিষ্টি স্বভাব, কিন্তু প্রথম দিন মনে হয়েছিল আপনার ভেতরে কী যেন আছে, আঘাত করবে।

ব্যাপারটা অনুভূতির, ওটা বরং বুঝতে পারি। কিন্তু আমার নাম শুনে চমকাবার কী আছে ভেবে পেলাম না।

বললাম, কাল তো আপনাকে দেখিনি মি. সেন।

কাল ভয়ানক মাথা ধরেছিল। ওর মা তো কালকের সামান্য দোলানিতেই শয্যা নিয়েছেন।

মিসেস সেন সঙ্গে এসেছেন নাকি ?

হ্যাঁ, ছাড়লেন না। বললেন, এই সুযোগে বিলাত দেখা না হলে আর হবে না।

চিত্রা বলল, ওঁকে খুব সম্ভব মা-কে দেখতে পাবেন না মি. মিত্র। জাহাজ পোর্ট ছাড়ার পরেই শুয়েছেন, আবার পোর্টে জাহাজ পৌঁছলে উঠবেন। আপনি কী পড়তে গিয়েছিলেন মি. মিত্র ?

পড়তে নয়, বেড়াতে।

বেড়াতে ! সত্যি ! কোথায় কোথায় ঘুরলেন ?

ঘুরেছি অনেক, আজ চার বছর ওই কাজই তো করছি !

আমেরিকায় গিয়েছিলেন ?

ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

চিত্রা মি. সেনের দিকে চেয়ে বলল, বাবাকে কত বললাম, চলো বাবা ঘুরে আসি। আর কি আসা হবে !

সস্নেহ অভিযোগ। মৃদু অভিমানের ছায়ায় চিত্রার মুখখানি অপূর্ব হয়ে উঠল। মি. সেন কন্যার ডান হাতটি হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে সস্নেহে বললেন, সময় হল না যে রে ! আর তোর মা সঙ্গে রয়েছেন, অত ঘোরা কি তার পোষায় ?

চিত্রা বললে, বুঝি তো ! তবু—

মি. সেন বললেন, তবু দুঃখটা চেপে রাখতে পারি না। ভাবনা নেই রে, আমেরিকা তোর দেখা হবে। সেকালের রাজাদের মতো আমিও না হয় একটা পণ ঠিক করে দেব যে বিয়ের পর আমার মেয়েকে আমেবিকা বেড়িয়ে আনবার প্রতিজ্ঞা করবে, তবে মেয়ের বিয়ে দেব।

চিত্রার মুখের ওপর কে যেন সিঁদুর ছড়িয়ে দিল, বললে, যাও ! তুমি বুঝি সেকেলে রাজা ?

আরে রাজা হওয়া তো সোজা ! তোর মতো একটি রাজকন্যা মেয়ে থাকলেই হল।

৩

মনেব সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রযোজন হল না ; স্পষ্টই বুঝলাম চিত্রাকে আমার চাই। এ চাওয়ার হাত থেকে আমার মুক্তি নেই। বূপ হিসাবে সেই তুর্কি মেয়েটির কাছে চিত্রা হয়তো দাঁড়াতেও পারবে না, কিন্তু সে মেয়েটির বূপ ছিল শুধু দেহের সৌন্দর্য। অন্তরের ছায়াপাতে তার বাইরের বূপ মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠেনি। সে চেয়েছিল খেলা করতে, আমিও চেয়েছিলাম তাই। অন্তরের যোগ না থাকায় তাই তার অমন বূপও আমার অন্তরে রেখাপাত করতে পারেনি।

চিত্রার বূপের স্পর্শে আমার সেই জ্বালা-ভরা বূপপিপাসা তেমনভাবে সাড়া দিল না। তাকে পাবার কামনা অপূর্ব মধুর বেদনার বূপ নিয়ে আমার অন্তরে ভবে গেল। প্রথম দর্শনে ভালোবাসা কাব্যের কথা ; সে সব কিছু নয়। কিন্তু কেমন যেন একটা নতুন রকম অনুভূতি। চিত্রাকে চাই, কিন্তু এতদিন যেভাবে চেয়েছি সেভাবে নয় মনে হল কোথায় যেন একটি ফুলের কুঁড়ি ফুটে উঠছে, আমার এতদিনকার চাওয়া দিয়ে চিত্রাকে কামনা করামাত্র সে কুঁড়িটি ঝলসে পুড়ে যাবে, ফুটবে না।

অনেক রাত পর্যন্ত ডেকে বসে নিজের অন্তবকে একবাব বুঝবার চেষ্টা কবলাম।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, আকাশে অনেক তারা। কোনোটি শুধু চেয়ে আছে, যেন যে মহাশূন্যে চিরদিনের জন্য তাব স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তার সীমা কোথায় গিয়ে মিশেছে সে কথা ভেবে পলক হারিয়ে ফেলেছে। কোনোটি চপল বিরাট আকাশের বিপুল গাম্ভীর্যের মাঝে থেকেও চোখ টিপে টিপে কেবলি ইশারা করে চলেছে !

নিজেকে বড়ো ছোটো, বড়ো অপদার্থ মনে হতে লাগল। কেউ বলে দিল না কিন্তু অন্ধকারে বসে একটা অহেতুক বেদনার সঙ্গে আমার মনে হল, অসংযত যৌবন যেন ধাপে ধাপে আমায পশুত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে। জানি সবই, যৌবনের যত জযগান, নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে বড়ো বড়ো পণ্ডিতের যত গভীর গবেষণা, বিশ্বসাহিত্যের নতুন প্রবাহে যৌবন বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব—জানতে তো বাকি ছিল না কিছুই ! যৌবন যখন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠেছিল তখন মনে প্রাণে বিশ্বাসও করেছি, পাপ-পুণ্য মিথ্যা, নবনারী পরস্পরের জনাই সৃষ্ট হযেছে, তাদের মিলনকে নিযন্ত্রিত কবাবাব অধিকার সমাজ ধর্ম কারুবই নেই ! তখন জেনেছি, হিসাব করে যৌবনকে খরচ করা ভয়ের পরিচয, যৌবনের পঙ্গুতার পরিচয়, যৌবনের পঙ্গুতার লক্ষণ।

কিন্তু সেদিন অন্ধকার নিশীথে মনে হয়েছিল—তাই কী ? অসংযত যৌবনের পরিচর্যা করা পশুধর্মের কতটুকু উপরে ? দোষ না থাক, লক্ষ লক্ষ ঈশ্বর বিশ্বাসীব মতে যা অন্যায়, যা পাপ তা শুধু স্বভাবের নিয়ম হোক, বিজ্ঞান অঙ্ক কষে স্থির করুক, প্রেম-ভালোবাসা সমস্তই সেই স্বভাবের চিরন্তন দাবির বূপান্তরমাত্র, কিন্তু সেইটুকুই কি সব ? তবে সেই স্বভাবের নিয়ম মেনেই যে দুটি নারীর সঙ্গে খেলা করে এলাম তাদের কথা ভেবে আমার মনে এ আগুন জ্বলে কেন ?

সংস্কার ?

আজন্ম অভ্যস্ত ভালোমন্দের জ্ঞান ?

সেও তো স্বভাবেরই নিয়ম !

হায় রে, তখন তো বুঝিনি ! দেহের যৌবনকে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম অস্ত্রে বিশ্লেষণ করে যে সত্য আবিষ্কৃত হল, সে যে সত্য তা অস্বীকার কবা চলবে না, কিন্তু সেই সত্যের মাপকাঠিতে মনের যৌবনের বিচার করি কোন যুক্তিতে ? বিকৃত যৌবন দেহের অণুতে পরমাণুতে যে অত্যুগ্র জ্বালা ধরিয়ে দেয়, তাবই জের টেনে চলি মনের দোবগোড়া পর্যন্ত। সে যৌবন যতখানি জ্বলে, ধূমোদ্গার করে তার চেয়ে অনেক বেশি। সেই ধূমের স্পর্শে মনের শুদ্ধতম, শুভ্রতম শাশ্বত যৌবন মলিন হয়ে যায়। জ্ঞানের হাটে তখন তাকে দেহের যৌবনের সঙ্গে একদামে বিক্রি করি ! আমারই মতন সর্বহারা

দুঃখের মাঝে যারা যৌবনের স্নিগ্ধ-শান্ত কমনীয় মূর্তির দেখা পেয়েছে, তাদের বুকে লুকিয়ে থেকে যৌবনের দেবতা মানুষের নির্দয় লাঞ্ছনায় কাঁদে। একটু চুপ করে থেকে জগদীশ বলল, থাক গে। ও লাঞ্ছনার তো শেষ নেই, সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সমভাবেই চলে আসছে।

জাহাজে চিত্রার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠতার সুযোগ সে দেয়নি। স্পষ্ট বুঝতাম আমায় এড়িয়ে চলতে চায়। আলাপ করত ভাসাভাসাভাবে, আন্তরিকতার পরিচয় পেতাম না।

জাহাজ যেদিন বোম্বে পৌঁছবে তার পূর্ব দিন একটি ঘটনায় আমার প্রতি তার মনের ভাব পরিবর্তিত হয়ে গেল। অন্তত তার বাইরের ব্যবহারে অনেকটা আন্তরিকতা দেখা গেল।

সেদিন বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জোর বাতাস বইতে আরম্ভ করল। সাগরের ঢেউয়ের মাতলামি বেড়ে যাওয়ায় জাহাজ অত্যন্ত দুলতে লাগল। মি. সেন সঙ্গে সঙ্গে শয্যা নিলেন। মিসেস সেন একটু সামলে নিয়েছিলেন, দুদিন ডেকেও এসেছিলেন, তিনি আবার কেবিনে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। ডেকে বায়ুসেবনকারীর সংখ্যা হঠাৎ আশ্চর্য রকম কমে গেল। চার বছরে কতবার সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছি, প্রবল ঝড়ে উত্তাল সাগরের বুকে জাহাজের অত্যধিক রকমের বিশ্রী দোলায় কতবার দুলেছি, এতো তার কাছে ছেলেখেলা। কেবিনে বন্ধ থাকা আমার পোষায় না, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে জাহাজের নাগরদোলায় দুলতে দুলতে ঢেউয়ের ওঠানামা দেখতে লাগলাম।

মি. মিত্র !

ফিরে দেখি, চিত্রা।

অবাক হয়ে বললাম, আপনি যে এখনও দাঁড়িয়ে আছেন ? জাহাজের অর্ধেক লোক শুয়েছে।

চিত্রা বললে, বাবাও শুয়েছেন। কী করা যায় বলুন তো ?

করবার কিছু নেই। বাতাস কমলেই মি. সেন উঠে পড়বেন। কাল বোধ হয় পৌঁছে যাব।

কিন্তু আমারও যে মাথা ঘুরছে ; আর গা বমিবমি করছে !

কোনো ওষুধ নেই ?

বললাম শুয়ে থাকাই সব চেয়ে ভালো ওষুধ। মাথা ঘুরছে যখন বিছানায় গিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকুন, আপনা হতে কমে যাবে।

ডেকে বাতাসে বেড়ালে মাথাধরাটা-- হাতের রুমালের কথা ভুলে গিয়ে চিত্রা দুহাতে শাড়ির আঁচলটা মুখে গুঁজে দিল। তার মুখ আবক্ত হয়ে উঠল।

বুঝলাম।

বললাম, শিগগির আসুন আমার কেবিনে।

বলে অগ্রসর হতেই চিত্রা আমার একটা হাত একহাতে চেপে ধরল। পাকস্থলীর যে জিনিসগুলি বাইরে আসবার জন্যে ঠেলাঠেলি লাগিয়েছিল, তাদের দমন করে রাখতেই তার সবটুকু শক্তি ব্যয় হচ্ছে বুঝে আমি চিত্রার বাহুমূল ধরে নিয়ে চললাম। চিত্রাদের কেবিন জাহাজের শেষপ্রান্তে ; একটু দূরে ! আমার কেবিন কাছেই, দরজা ঠেলে ভেতরে আসতেই চিত্রা মেঝেতে বসে পড়ল। এতক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টায় দমন করেছিল, আর পারল না। মুখে চোখে জল দিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছিয়ে হাত ধরে তুলে আমার বিছানায় শুইয়ে দিলাম। চিত্রা তখন থরথর করে কাঁপছে।

একটু সুস্থ হয়ে মাথা তুলে মেঝের দিকে চেয়ে চিত্রা বলল, ছি ! ছি ! কী করলাম ! মেঝেটা নোংরা হয়ে গেল।

বললাম, কুণ্ঠিত হবেন না মিস সেন, ধুয়ে দিলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। মেথরকে ডেকে দিতে বলে দিয়েছি। আর একটু নেবু খাবেন ?

চিত্রা ঘাড় নাড়ল। উত্তেজনায় তখনও তার দুচোখ জলে পরিপূর্ণ, আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলল, আপনার কেবিনটা যদি কাছে না থাকত মি. মিত্র, অত লোকের মাঝে ওই কাণ্ডটি করলে লজ্জায় আমি মরেই যেতাম। আপনাকে যে কী বলে—

লজ্জা দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না। সে কাজটা না হয় পরেই করবেন ? বমিবমি ভাবটা কমল ?

চিত্রা ঘাড় নাড়ল, একটুও না। গলাটা জ্বলছে। কী করব ?

শিশুর মতো অসহায় প্রশ্ন ! দুবছর বিলাতে কাটিয়েছে !

কী আর করবেন ? একটু শুয়ে থেকে উঠে কেবিনে চলে যাবেন।

উঠব কী করে ? দাঁড়ালেই এবার নাড়ি সুদ্ধ উঠে আসবে।

না না, কিচ্ছু হবে না। না হয় আপনি এখানেই থাকবেন, আমি অন্য বন্দোবস্ত করে নেব।

আপনি বোধ হয় ভাবছেন মি. মিত্র, এ রকম তো আজ অনেকের হয়েছে, আমার মতো কেউ অস্থির হয়ে পড়েনি। সত্যি বলছি, আমার মতো বেশি কারও হয়নি। কী রকম যে লাগছে বলা যায় না। মনে হচ্ছে বিছানা ছেড়ে কোনোদিন উঠতেই পারব না।

আগে আর হয়নি কিনা, তাই এ রকম লাগছে। কালকেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বলে সান্ত্বনা দিলাম।

মেথর এসে মেঝে পরিষ্কার করে দিয়ে গেল।

চোখ বুজে চিত্রা কী ভাবল সেই জানে, খুব সম্ভব আমার কেবিনে বেশিক্ষণ থাকাটা লোকের চোখে বাজবে এ কথাটা তার হঠাৎ খেয়াল হল। চোখ খুলে বলল, আমায় বরং কেবিনে দিয়ে আসুন।

আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন না ?

না অনেকটা ভালো লাগছে, এই বেলা যাওয়া ভালো।

আমার একটা হাত চেপে ধরে মনের জোরে কম্পিত পা দুটিকে স্থির করবার চেষ্টা করতে করতে চিত্রা তার কেবিনে প্রবেশ করল।

ফিরে এসে আমি সেই বিছানায় মুখ গুঁজে পড়লাম।

মনে হল এইটুকু সময়ের ভেতরে যেন বিছানার স্পর্শটুকু পর্যন্ত বদলে গেছে। উপাধানে মৃদু সুবাস, যেন মুহূর্তপূর্বে সে যে কুন্তলের পরশ পেয়েছিল সেই স্পর্শের অতি মৃদু স্মৃতি। ঘরের বাতাসটি পর্যন্ত যেন চৈত্র রাতের দখিনার মাধুর্যে ভরে উঠেছে মনে হল।

জগদীশ হঠাৎ চুপ করল।

আমার কাছেই পাথরের ফাটলে একটি বনফুলের চারায় একটিমাত্র ফুল ফুটেছিল। পাথরের বুকে রসের সংবাদ চারাটি কী করে পেয়েছিল সেই জানে, কিন্তু ভুল সংবাদ পায়নি। ফুল ফুটিয়ে তার প্রমাণ দিয়েছে। ফুলটি তুলে নাকের কাছে ধরলাম। অস্পষ্ট সুবাস। নীল সাগরের বুকে গতিশীল জাহাজের কেবিনে আমার বন্ধুর শয্যার উপাধানটি তার প্রিয়তমার কেশের যে মৃদু গন্ধটি চুরি করে রেখেছিল যেন তারই অস্ফুট প্রতিধ্বনি এই নাম-না-জানা ফুলটির বুকে ফুটে উঠেছে !

জগদীশ আবার বলতে আরম্ভ করল, বিকালের দিকে বাতাস কমে গেল। যাঁরা বিছানা নিয়েছিলেন তাঁরা একে একে শুকনো মুখ নিয়ে ডেকে এসে হাঁফ ছাড়লেন। মি. সেন, মিসেস সেন ও চিত্রা তিনজনেই এসে চেয়ার দখল করে বসে পড়ল।

হেসে প্রশ্ন করলাম, কেমন আছেন সব ?

প্রত্যুত্তরে মিসেস সেন ক্ষীণভাবে একটু হাসলেন।

মি. সেন বললেন, তুমি কিন্তু মহা ভাগ্যবান !

চিত্রা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল।

চিত্রা আর আমাকে এড়াবার চেষ্টা করল না। তাব ব্যবহারে এতদিন যে ইচ্ছাকৃত আন্তরিকতার অভাব আমায় পীড়া দিচ্ছিল, এরপর থেকে আর তার চিহ্নও খুঁজে পেলাম না। মনে হল দুজনের পরিচয়ের মাঝখানে যে পর্দাটি ছিল সেদিনের জোর বাতাসে সেটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে !

আনন্দে আমার অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল। বিশেষ কিছু নয়, যে কোনো পরিচিতা মেয়ে আমার সঙ্গে ও রকম ব্যবহার করত, কিন্তু তার বিমুখতার ভাবটি কেটে গিয়ে আমাদের পরিচয় যে স্বাভাবিক স্বচ্ছতা লাভ করল তাই আমার পবম সম্পদ বলে মনে হতে লাগল।

কলকাতায় বিদায় নেবার সময় মি. সেন ও মিসেস সেন কলকাতায় এলেই তাঁদেব বাড়ি যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। চিত্রা শুধু বলল, আসবেন কিন্তু মি. মিত্র, ভুলবেন না।

আহ্বানের সুরটা আমাব মনের পছন্দ হল না। মনকে বোঝালাম, ওই যথেষ্ট।

বাড়ি ফিরে দেখলাম, বাবা নেই। তারপর মাস চারেকেব কথা তুমি জানো।

## ৪

বাড়ি বসে থাকতে ভালো লাগল না, হঠাৎ একদিন কলকাতা চলে গেলাম।

চিত্রাদের বাড়ি যখন গেলাম তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে এবং ড্রইংরুমে সান্ধ্য মজলিশ বসেছে।

চিত্রা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করল। মিসেস সেন ভারী খুশি।

চার মাস বাড়িতেই ছিলেন নাকি মি. মিত্র ?

হ্যাঁ।

চলুন বাবার সঙ্গে দেখা করবেন। ভয়ানক কাজ পড়েছে, আপিস ঘরেই প্রায় সময় থাকেন।

ঘবের বাইরে এসে বললাম, আপনার অনেক বন্ধু জুটেছে দেখছ

হ্যাঁ। সব গুণীলোক। মি. রায়ের গান শুনলে অবাক হয়ে যাবেন।

মি. রায় ? সকলের শেষে যাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন উনিই কি মি. রায় ?

হ্যাঁ। ভেতরে আসব বাবা ?

ভিতরে মি. সেনের কণ্ঠ শোনা গেল, না না এসো না, তুমি এলেই মাথা গুলিয়ে দেবে।

চিত্রা হেসে বলল, মি. মিত্র এসেছেন বাবা।

মি মিত্র ? কোন মি. মিত্র ? ললিতাব বাবা ? নাঃ, তুমি সব গোলমাল বাধিয়ে দিলে দেখছি ! চলো যাচ্ছি।

চিত্রা আমার দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বলল, কাজ করবার সময় বাবা বিশ্বসংসার ভুলে যান।

মি. সেন দরজা খুলে আমায় দেখে বললেন, ' রে, তুমি ! তুমি আবার মিস্টার নাকি ? বিদেশে যাই হোক, দেশে ও সব মিস্টারের বালাই রেখো না হে !

বলে সশব্দে হাসলেন।

চিত্রা হেসে বলল, তুমিও তো মিস্টার, বাবা।

এককালে ছিলাম, এখন আর নাই। অনন্তবাবু হতে ভারী ইচ্ছে, কিন্তু কমলি ছাড়ছে না ! বলে আবার হাসলেন।

আমার আগমনে যে ভারী খুশি হয়েছেন এবং বিপর্যয় কাজের জন্য দুদণ্ড আমার সঙ্গে গল্প করতে পারছেন না বলে যে ভারী দুঃখিত হয়েছেন বারবার এ কথা প্রকাশ করতে করতে ঘরে ঢুকে মি. সেন নথিপত্রে ডুব দিলেন। আর একটা কাজ করলেন, পরদিন আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন।

ড্রইংরুমে ফিরবার পথে বললাম, আপনার বাবার সহজ ব্যবহার আমার এমন ভালো লাগে মিস সেন !

চিত্রা বললে, বাবা ওই রকম, যাকে স্নেহ করেন তার সঙ্গে ব্যবহারে একবিন্দু এটিকেট মেনে চলেন না।

স্নেহ করেন ! কথাটায় অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠলাম।

সকলের মিলিত অনুরোধে চিত্রা গান ধরল। নতুন শিখে আসা ইংরাজি গান, মিষ্টি করুণ সুর।

গান শেষ হলে সকলে এমন সকলরব প্রশংসা আরম্ভ করে দিলেন যে আমার অন্তরেব সুর-প্রেমিক লজ্জায় মাথা হেঁট করল।

জলধি রায় কেবল দেখলাম নীরব প্রশংসায় গানের প্রকৃত মর্যাদা দিলেন। আরও একটা জিনিস দেখলাম, লোকটির চেহারা। বাঙালি যুবকের যে গ্রিক ভাস্করের খোদাই করা মূর্তির মতো অমন চেহারা থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। বড়ো বড়ো দুটি চোখে অন্তরের কবিপ্রাণ উঁকি মারছে। খদ্দরের পাঞ্জাবি আব আর চাদরমাত্র তার পরিধানে, কিন্তু মনে হয় লোকটা কত যত্নেই না বেশভূষা করেছে ! স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ, ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি। মাথার চুলে পর্যন্ত বৈশিষ্ট্যের ছাপ, যেভাবে বিন্যাস করা আছে মনে হয় ঠিক সেভাবে ছাড়া আর কোনো উপায়েই বিন্যস্ত কবা চলে না।

রায়ের দিকে চেয়ে চিত্রা বলল, প্রশংসা ?

রায় বলল, এমন ভালো লাগছিল যে প্রশংসা করতে ভুলেই গিয়েছি, এটা কি কম প্রশংসা হল ?

চিত্রা হাসল।—তা বটে, আপনার প্রশংসার অরিজিনালিটি আছে। মি. মিত্রকে আপনার গান শুনিয়ে দেবেন না জলধিবাবু ? বলে আমার দিকে চাইল।

বললাম, এইমাত্র মিস সেনের কাছে আপনাব গানের এমন প্রশংসা শুনেছি মি. রায়, যে আপনার গান না শোনার ক্ষতিটা বড়ো বেশি হবে বলে মনে হচ্ছে।

চিত্রা বলল, ইংরাজি নয় কিন্তু, বাংলা কিংবা হিন্দি।

রায় বলল, তোমার ইংরাজি সুরে সবার কান ভরে আছে, একটা বাংলা গান গেয়ে সেটুকু কাটিয়ে দাও, তারপর না হয় মি. মিত্রের ছোটো ক্ষতির অহেতুক ভয়টা বড়ো ক্ষতি দিয়ে মিটিয়ে দেব।

রায়ের তুমি সম্বোধনটা আমার কানে বাজল।

চিত্রা হেসে বলল, কী গাইব ?

ফরমাশ ? আচ্ছা গাও—এই লভিনু সঙ্গ তব।

কারণ কী বোঝা গেল না, রায়ের ফরমাশ শুনে চিত্রার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। স্পষ্ট বোঝা গেল ও গানটা গাইতে তার বিশেষ আপত্তি আছে। ভারী বিস্ময়বোধ হল।

একটু ইতস্তত করে চিত্রা গাইল। কবির অন্তরে সুন্দরের সঙ্গলাভে যে অনির্বচনীয় আনন্দসুধা সঞ্চিত হয়েছিল ছন্দে গাঁথা কথার চারিদিকে সুরের মালা জড়িয়ে সেই আনন্দ বাইরে প্রকাশ করবার চেষ্টা শ্রবণে যেন মধুবর্ষণ করে গেল।

চিত্রার পর রায় গাইল। হিন্দি গান। সুন্দর জমজমাট গলা, গাইবার ভঙ্গি চমৎকার। রাগরাগিণীর জ্ঞান আমার খুব টনটনে নয়, কিন্তু মালকোশ বলেই চেনা চেনা ঠেকল। অনাড়ম্বর চেষ্টায় প্রকৃত সাধকের মতো রায় গেয়ে গেল। আনন্দ পেলাম অনেকখানিই, কিন্তু গান যখন শেষ হল তখন আমার মনে হল কী রকম একটা অস্বস্তি সেই আনন্দের গলা টিপে ধরেছে।

চিত্রার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। জলধি রায়ের অমন অনবদ্য সুর-সৃষ্টির গর্বটা যেন তারই।

বাইরে তখন জ্যোৎস্নার বান ডেকে গিয়েছে। বাগচি প্রস্তাব করল, লনে গিয়ে চায়ের সঙ্গে জ্যোৎস্না উপভোগ করা যাক। চিত্রা বলল, চায়ের সঙ্গে জ্যোৎস্না। আপনি হাসালেন মি. বাগচি। হাসালাম ? কবি ছাড়া জ্যোৎস্নার উপভোগের এমন চমৎকার উপায় আর নেই মিস সেন।

কবি ছাড়া কেন ?

কবির কি দোমনা হবার সাধ্য আছে যে একসঙ্গে চা আর জ্যোৎস্না উপভোগ করবে।

সবাই হাসল।

মিসেস সেন বললেন, হিম লেগে তোমাদের অসুখ করবে। কার্তিকের জ্যোৎস্না উপভোগের জন্য নয়।

বোস হাসিমুখে বলল, ডোন্ট ইনসাল্ট আওয়ার ইয়ং এজ, মিসেস সেন।

লনে যেতে একপাশে ফুলের বাগান। পথের ধারেই ছোট্ট একটি গোলাপ চারায় প্রকাণ্ড এক রক্তগোলাপ ফুটে আছে দেখলাম। অন্য চারায় অজস্র ফুল কিন্তু সে চারাটির সম্পদ ওই একটি। সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না মেখে নিঃসঙ্গ ফুটে আছে।

বললাম, ভারী সুন্দর ফুলটি তো। কতটুকু চারায় ফুটেছে।

চিত্রা থমকে দাঁড়াল।

ফুলটি তুলে নিয়ে এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। তারপর রায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনার গান আজ ভারী আনন্দ দিয়েছে জলধিবাবু, এই ফুলটি আমার হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

রায় হাত বাড়িয়ে ফুলটি নিয়ে অস্ফুটস্বরে কী বলল বোঝা গেল না।

জ্যোৎস্নার দীপ্তি নিমেষে আমার চোখে ম্লান হয়ে গেল। জেলাসি নয়, ঈর্ষার জ্বালায় মাধুর্য আছে। অপমানের জ্বালায় জ্বলুনি ছাড়া আর কিছু নেই। জ্যোৎস্নালোকে চিত্রার অপূর্ব সুন্দর কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে কামনা করলাম, এই শরতের জ্যোৎস্না শ্রাবণের মেঘে ঢেকে দিক। জ্যোৎস্না থাকবার কোনো প্রয়োজন আজ আর নেই।

রায়ের হাতের গোলাপটির ওপর চোখ পড়ল, মনে হল আমার সবটুকু রক্ত জমাট বেঁধে ওই ফুলটির সৃষ্টি হয়েছিল, আমার অন্তরের মালঞ্চ হতে চিত্রা সেটিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এত গম্ভীর হয়ে পড়লেন যে মি মিত্র ?

চমকে চিত্রার মুখের দিকে চাইলাম। হৃদয়হীন মানুষের নিষ্ঠুরতারও সীমা আছে, নারীর নিষ্ঠুরতার সীমা নির্দেশ করতে ঈশ্বরের বোধ হয় ভুল হয়েছিল। এক মুহূর্তে কর্তব্য স্থির হয়ে গেল। হেসে বললাম, জ্যোৎস্না দেখে ভাব লেগেছে মিস সেন।

কিন্তু এদিকে চায়ের যে শীত লাগবার উপক্রম হল।

অনাবশ্যক হাসি হেসে বললাম, চা তুচ্ছ। এমন জ্যোৎস্না—

রায়ের দিকে নজর পড়ল। তার মুখে হাসি নেই, মুখে বেদনার ছাপ। উপহারের গোলাপটি নাকের কাছে ধরে স্থির ম্লান দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। সহানুভূতিভরা করুণ দৃষ্টি। চোখের দৃষ্টি যে মানুষকে এতখানি লজ্জা দিতে পারে আর অপমান করতে পারে সেইদিনই প্রথম অনুভব করলাম। ইচ্ছে হতে লাগল চায়ের চামচ দিয়ে লোকটার বড়ো বড়ো চোখ দুটি উপড়ে আনি। কিন্তু হাসিমুখেই বললাম, মি. রায়, শুনলাম আপনি নাকি সুন্দর বাঁশিও বাজাতে পারেন। আপনার গান শুনে যারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে, বাঁশি বাজিয়ে তাদের একেবারে আত্মহারা করে দিন না ? এমন জ্যোৎস্না, একটু বাজালে কৃতার্থ হব।

চিত্রার মুখের দিকে চাইলাম, আঘাতটা ঠিক পৌঁছেছে কি না। চিত্রার মুখ মুহূর্তের জন্য একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেল। বোঝা গেল, আমার খোঁচাটা সূক্ষ্ম বলে বেজেছেও বড়ো তীক্ষ্ণ হয়ে।

রায় প্রশংসার প্রতিবাদ করল না, বিনয় প্রকাশের চেষ্টা করল না, শুধু বলল, বাঁশি তো এখানে নেই।

নেই ? ও !

পরদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম।

মি. সেন দেখলাম সেদিন অন্য সকলকে একেবারে বাদ দিয়েছেন, নিমন্ত্রিত আমি একা।

চেয়ারে বসেই বিনা ভূমিকায় বলে বসলাম, কাল রাত্রের গাড়িতে পুরী যাচ্ছি মি. সেন।

চিত্রা চমকে আমার মুখের দিকে চাইল। মিসেস সেন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর উদ্‌বিগ্ন মুখের দিকে চেয়ে হাসি পেল। মিস্টার সেন আর মিসেস সেনের মনোভাব তো আমার অজানা ছিল না।

এমন হঠাৎ ? মিসেস সেন প্রায় কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

হেসে বললাম, বললাম, হঠাৎ নয়, বাড়ি থেকেই ঠিক করে বার হয়েছিলাম।

পুরীতে থাকব না, ঘুরে বেড়াব। পরের দেশ দেখতে চার বছর কাটিয়ে এলাম, নিজের দেশটা ভালো করে দেখা উচিত।

কবে ফিরবে ?

তার কোনো ঠিক নেই। কোনো প্রোগ্রাম করিনি। যেখানে ভালো লাগবে কিছুদিন থাকব। পাঁচ-ছবছর তো লাগবেই।

পাঁচ-ছবছর।

মৃদু হেসে বললাম, বাড়ি বসেই বা কী করব বলুন ? দূর-সম্পর্কীয় ছাড়া আত্মীয় কেউ নেই, তাদের কাছে থাকার চেয়ে দূরে থাকাতেই ভালো লাগে।

মিস্টার সেন বললেন, এ রকম ঘুরে ঘুরেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে নাকি ?

হেসে ইংরেজিতে বললাম, তা কী বলা যায়। কবে কার বাঁধনে ধরা পড়ে যাব ঠিক কী ? কী জানি কখন সে দুর্ভাগ্য হয়, এই বেলা স্বাধীনতাটুকু ভোগ করেনি ! নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলাম।

চিত্রা এতক্ষণ চুপ করেছিল, এবার কিছু বলা কর্তব্য মনে করেই বলল, পুরী কেন ? সমুদ্র তো আপনার দেখা আছে।

তা আছে, সমুদ্র দেখার জন্য নয়। জগন্নাথের দিকেও বিশেষ টান নেই। একজন বন্ধুর অসুখ, কিছু টাকা চেয়েছে। ভাবছি, নিজে গিয়ে দেখে আসি। নাহলে দিল্লি আগ্রার দিকেই যেতাম।

বন্ধুর কথাটা সত্য। সকালে বন্ধুর চিঠি পেয়েছিলাম।

চিত্রা বলল, বন্ধুর কী অসুখ ?

টি বি।

টি বি। তিনজনেই চমকে উঠলেন। চিত্রার মুখ একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। কেন যে গেল সে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করবার ইচ্ছা বা শক্তি, দুয়েরই তখন অভাব। এখন সে চেষ্টা করতেও ব্যথা বোধ হয়।

ডিনারের পর মিনিট দশেক বসেই টের পেলাম এবার চিত্রার মা বাবা দুজনেই অন্য ঘরে গিয়ে আমাদের নিরিবিলি কথা বলার সুযোগ দেবেন। কাজের ছুতা করে উঠে পড়লাম। বিদায় নেবার সময় বললাম, যেখানেই থাকি, মিস সেনের শুভ পরিণয়ের সংবাদ পেলেই ছুটে আসব।

চিত্রার বিবর্ণ মুখ একবার আরক্ত হয়েই ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

পুরী পৌঁছে বন্ধুর কাছে যাবার পথে মন্দিব পড়ল। চৌমাথায় গাড়ি যেতেই নেমে পড়লাম। মন্দিরে উঠে অভ্যন্তরের আবছা আলো আর প্রদীপের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দশ বছর বয়সের পর কখনও যা করিনি হঠাৎ তাই করে বসলাম। একেবারে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে মনে মনে বললাম, তোমার প্রতি আমার ভক্তির যে নিতান্তই অভাব সে কথা তুমিও জানো আমিও জানি। শতাব্দীর পর শতাব্দী লক্ষ লক্ষ অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা তো পেয়েছ, আমার একটুখানি ভক্তি দিয়ে তুমি কী করবে ? যদি পারো নিঃস্বার্থভাবেই এইটুকু দয়া কোরো ঠাকুর. তোমার সৃষ্ট এই আগ্নেয়শিখাগুলিকে আমার নয়ন-পথের অন্তরালেই রেখো।

উঠে দাঁড়াতেই এক পাণ্ডা গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বলল, মনস্কামনা পূর্ণ হবে বাবু।

তথাস্তু। পাণ্ডাটির মনস্কামনা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করে দিলাম।

বন্ধু আমায় দেখে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলল। অর্থাভাবে এবং রোগেব পীড়নে দেখলাম মরণেব দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

বন্ধুর ব্যবস্থা করতেই সমস্ত দিন কেটে গেল। সন্ধ্যাব পবেই নিশ্চিন্ততাব আবামে বহুকাল পরেই বোধ হয় বন্ধু বিছানায় আশ্রয় নিতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

নিস্তব্ধ বাড়িতে বসে থাকতে ইচ্ছা হল না। ধীরে ধীরে সমুদ্রতীরে গিয়ে ফ্ল্যাগস্টাফের কাছে পাকা বাঁধানো একটি আসনে বসে পড়লাম।

সেইখানে বসে চিরবিচ্ছেদেব বেদনা অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অন্তরের এক অপূর্ব তত্ত্ব আবিষ্কাব করলাম। চিত্রার রূপকে নয়, চিত্রাকেই আমি ভালোবাসি। তীব্র বেদনার মাঝে এই সত্যের অনুভূতি আমায় খুশি করে তুলল।

পূর্ণিমাব লঘু শান্ত জ্যোৎস্নাব সঙ্গে ঊর্মিপাগল উচ্ছ্বসিত সাগরের অপরূপ মিলনেব দিকে চেয়ে স্পষ্ট অনুভব কবলাম পৃথিবীর তুচ্ছ সুখ দুঃখ মিলন বিচ্ছেদের বহু ঊর্ধ্বে আমি চলে গেছি। আমাব পিছনেই কালো ইংবেজি অক্ষরে পুবী লেখা বাড়িটার মাথার ওপরে একটা আলো ঘুরে ঘুরে চারিদিকে সংকেত পাঠাতে লাগল। মনে হল আমার অন্তর-সমুদ্রের কোনো তীরে এমনি একটি মৃদু আলো জ্বলে আমাব দিকহারা মনেব সন্ধানে দিকে দিকে তার ক্ষীণ বশ্মিরেখার সংকেত প্রেরণ করছে। পাগলের মতো মন দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হাবিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল হঠাৎ সেই সংকেতের অস্পষ্ট অর্থ বোধ কবে থমকে দাঁড়িয়ে সলাজ-সঙ্কিত আনন্দের দৃষ্টিতে সেই আলোটিব দিকে চেয়ে আছে।

ডাক্তার বললেন, পুরীতে উপকার হবে না।

বললাম, চলো বন্ধু, বাঁচি যাব তোমার সঙ্গে।

বন্ধু কুণ্ঠিত হয়ে বলল, ছোঁয়াচে রোগ—

তার একটা হাত চেপে ধরে বললাম, বন্ধুর কাছে বন্ধুর রোগ আবার ছোঁয়াচে হয় নাকি ?

কৃতজ্ঞতায় মৃত্যুপথযাত্রীর চোখে জল এল। হায় রে ! ছলনার ভালোবাসারও এত দাম !

লালপুরে বাড়ি ভাড়া কবলাম। এক মাস পবে বন্ধুটি ইহলোক ত্যাগ করল।

সকালে বাড়ির সামনে বাগানে দাঁড়িয়ে একটি সদ্যফোটা লাল গোলাপের দিকে চেয়ে চিন্তা করছি পরদিনই পশ্চিমে পাড়ি জমাব কি না, চেনা গলার ডাক শুনলাম, মি. মিত্র !

চমকে চাইলাম।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে চিত্রা !

বললাম, কী আশ্চর্য ব্যাপার।

আমিও আপনাকে বাগানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। ভাবতেও পারিনি সকালে বেড়াতে বেরিয়ে আপনার দেখা পেয়ে যাব।

কবে এলেন আপনারা ?

কাল সকালে। আপনি ?

মাসখানেক এসেছি। মা-বাবা ভালো আছেন ?

মা-র ভারী অসুখ হয়েছিল। সেই জন্যই তো আমাদের আসা।

এখন মা ভালো আছেন। আসুন না আমাদের বাড়ি ?

আসব ? আচ্ছা।

ঘুরে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল সেই গোলাপটি। তুলে নিয়ে এসে চিত্রার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, হঠাৎ দেখা দিয়ে আপনি যে আনন্দ দিয়েছেন মিস সেন, এ ফুলটি আমার হয়ে সে জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

চিত্রার মুখ হাতের ফুলটির মতোই লাল হয়ে উঠল। ফুলটি নিয়ে সুবাস অনুভব করার ছলে সে মাথা নিচু করল।

আমায় দেখে মি. সেন মহাখুশি। মিসেস সেন আরও। মিসেস সেনের চেহারা দেখেই বোঝা গেল কঠিন অসুখ থেকে উঠেছেন।

গল্প চলল।

মিসেস সেন হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, কতদিন থাকবে এখানে ?

চলে যাবার কথা ভাবছি শুনেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমরা এলাম অমনি তুমি চলে যাবে ? তাহলে আমাদের মনে হবে আমরা এসেছি বলেই তুমি চলে যাচ্ছ।

সবিনয়ে প্রতিবাদ করলাম। বললাম, আপনারা এসেছেন জানবার আগেই আমার অর্ধেক জিনিস গোছানো হয়ে গেছে।

চিত্রা হঠাৎ কী ভেবে বলল, কিছুদিন থেকে যান না মি. মিত্র ? কাজ তো নেই, দুদিন পরে বেড়াতে গেলে আর কী ক্ষতি হবে ? আপনি থাকলে বেশ আনন্দে দিন কাটবে।

বললাম, থাকব কী মিস সেন, আপনি কি আমায় থাকতে দেবেন ?

তার মানে ?

আপনি যদি মি. মিত্র বলে ডাকেন তাহলে কী করে থাকি বলুন ?

চিত্রা হেসে বলল, আপনার পছন্দ নয় বুঝি ? কী বলে ডাকব তবে ? জগদীশবাবু ?

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনি আমায় মিস সেন মিস সেন করবেন আর আমি আপনাকে জগদীশবাবু বলব, সে ভারী বিশ্রী শোনাবে। আপনি যদি আমায় চিত্রা বলেন, তাহলে রাজি আছি।

নাম ধরে ডাকলে চটবেন না তো ?

চিত্রা হেসে বলল, নাম ধরে ডাকলে চটব না, কিন্তু নাম ধরে ডেকে যদি আপনি বলে কথা কন তাহলে চটব।

মিসেস সেন সে বেলা তাদের ওখানে খাওয়ার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

চিত্রা বলল, আমি নিজে রাঁধব জগদীশবাবু।

বাড়ি ফিরে মনে হল, জীবনের পাত্রে সঞ্চিত সমস্তটুকু বেদনা এই ক-ঘণ্টায় উপে গিয়ে সেই শূন্য পাত্র অকস্মাৎ সুধাবর্ষণে পূর্ণ হয়ে গেছে।

বিচিত্র জীবন। বিচিত্র তার দেনা-পাওনার হিসাবনিকাশ।

সন্ধ্যার পর চিত্রা গান শোনাল। রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাদের ওখানে থেকে ফিরলাম। জ্যোৎস্নায় তখন চারিদিক ভরে গেছে। বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে জ্যোৎস্নালোকে অদূরে আবছা মোরাবাদি পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলাম। বাইরের জ্যোৎস্না আমার অন্তরের জ্যোৎস্নার কাছে তখন ম্লান হয়ে গেছে।

ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙল, অন্ধকার নেই। ঠিক সামনে গাছপালার ওদিকে বুঝি সূর্য উঠবে, আকাশের গায়ে রংয়ের ছাপ পড়েছে। সোজা হয়ে বসে সিগারেট ধরালাম।

খুব ভোরে উঠেছেন যে।

চিত্রা এসে দাঁড়াল।

বোসো। এখনও উঠিনি।

ওঠেননি মানে ?

মানে, ঘুম ভেঙেছে বটে, কিন্তু বিছানা ছেড়ে ওঠা হয়নি।

এই চেয়ারটাতেই কাল বিছানার কাজ চালিয়েছিলেন বুঝি ? বেশ লোক তো ?

বললাম, ইচ্ছে করে নয়, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তোমার স্নান পর্যন্ত হয়ে গেছে দেখছি।

সকালে স্নান না করলে আমার ভারী বিশ্রী লাগে। উঃ, আকাশটা কী রকম লাল হয়ে উঠল দেখেছেন ?

আকাশ নয়, আমি তখন চিত্রাকে দেখছি। ভেজা ফুলের মতো মুখখানিতে না-ওঠা সূর্যের আভা লেগে যে সৌন্দর্য সেদিন জেগেছিল, দেখে মনে হয়েছিল কোন পুণ্যে আমার চোখ দুটির অত বড়ো সৌভাগ্য সম্ভব হল। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বার হয়ে গেল, তোমাকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছে চিত্রা।

কবির চোখে কী না সুন্দর লাগে বলুন ? বেড়াতে যাবেন ?

চিত্রার সহজ কণ্ঠে অত্যন্ত লজ্জাবোধ হল। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চলো।

ফিরবার পথে হঠাৎ চিত্রা প্রশ্ন করলে, আপনার কি কোনো অসুখ হয়েছিল ?

না, কেন বলো তো ?

রোগা হয়ে গেছেন।

চিত্রা !

বলুন।

আমার একটা কথা রাখবে ? আমাকে আপনি বোলো না।

চিত্রার মুখ গম্ভীর হল। একটু চুপ করে থেকে বলল, কী যে বলেন। জগদীশবাবু বলা চলতে পারে, তুমি বলা কি সম্ভব ?

সম্ভব নয় ?

আপনিই ভেবে দেখুন সম্ভব কি না। রাগ করবেন না, বুঝে দেখুন।

না, রাগ করব কেন ?

চিত্রা একবার আমার মুখের দিকে চাইল কিন্তু কিছু বলল না। নিঃশব্দে বাকি পথটুকু অতিবাহিত হয়ে গেল।

গেট পার হয়ে বাগানের মাঝামাঝি গিয়েছি, চি.. ডাকল, জগদীশবাবু একটু দাঁড়ান।

দাঁড়ালাম।

রাগ করে আমাদের বাড়ি যাওয়া যেন বন্ধ করবেন না।

রাগ তো আমি করিনি। রাগের কী আছে ?

না থাকলেই ভালো।

বলে চিত্রা চলে গেল। যে কথা বলে গেল সে কথা বলতে সে যে আমায় দাঁড় করায়নি সেটুকু বেশ বুঝতে পারলাম। বুঝে হঠাৎ খুশি হয়ে উঠলাম। মূর্খ আমি, অন্ধ আমি, তাই।

স্থানীয় সিভিল সার্জেনের সঙ্গে বিলাতে পরিচয় হয়েছিল। তিনি আর তাঁর স্ত্রী বিকালে এক রকম জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন। যখন ফিরলাম, তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে।

ফিরেই চিত্রাদের বাড়ি গেলাম। মিস্টার সেন আর মিসেস সেন বেড়াতে গিয়ে ফেরেননি। চিত্রা এক ইজিচেয়ারে চুপচাপ পড়ে আছে। তার বাঁ পায়ের গোড়ালির কাছে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

পায়ে কী হল ?

মচকে গেছে।

কী করে মচকাল ?

সিঁড়িতে পা পিছলে গিয়েছিল। বসুন।

খুব ব্যথা হয়েছে ?

না, সামান্য। মা-বাবা দুজনেই বেরিয়েছেন, একা একা এমন বিশ্রী লাগছিল ! ঠিক সময়েই আপনি এসেছেন জগদীশবাবু।

খুশি হয়ে বললাম, বাইবে চলো, জ্যোৎস্নায় বসা যাবে। ভারী সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। আজ বোধ হয় পূর্ণিমা।

মাথা নেড়ে চিত্রা বলল, পূর্ণিমা নয় চতুর্দশী, এক কলা এখনও বাকি আছে। যেতে তো ইচ্ছে করছে, কী করে যাই ?

সেও একটা কথা বটে। থাক পায়ে আবার লাগবে।

ডান হাতটি নিঃসংকোচে বাড়িয়ে দিয়ে চিত্রা বলল, ধরুন, হাঁটতে পারি কি না দেখা যাক। এইটুকু তো।

হাত ধরে সন্তর্পণে চিত্রাকে দাঁড় করালাম। বাঁ পায়ের ওপর ভর দেবার চেষ্টা করে বললে, উহুঁ, লাগছে। আর একটু সরে আসুন, ভালো করে ধরি।

স্পন্দিত বক্ষে কাছে সরে গেলাম। চিত্রার শাড়ির প্রান্ত আমার অঙ্গ স্পর্শ করল। তার কেঁশের সুবাস আমাব চিত্তকে আচ্ছন্ন করে দিল। ডান হাতখানা আমার কাঁধে রেখে শরীবের সবটুকু ভার আমার ওপরে দিয়ে চিত্রা বলল, চলুন।

চলব ? কোথা চলব ? পায়ের নীচে তো মাটি ছিল না। বিশ্ব তখন লুপ্ত হয়ে গেছে, দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে পাগলের মতো নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিঃশেষে মুছে গিয়ে কালের মহাশূন্যে কেবল বর্তমানের ক্ষণটি দুলছে। যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত কামনার উষ্ণ নিশ্বাসে উদ্‌ভ্রান্ত সেই ক্ষণটি যেন আমার জন্মজন্মান্তরের সম্পদ,—অতীতকে মুছে নিয়ে, অসহ দ্যুতিময় তৃষ্ণা-যবনিকার অন্তরালে ভবিষ্যৎকে আড়াল করে সেই ক্ষণটি যেন আমার কানে কানে মিনতি করে গেল, নাও, নাও, এইবেলা যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত তৃষ্ণা মিটিয়ে নাও।

সংজ্ঞা ফিরতে দেখলাম আমার দুই বাহুর বেষ্টনে চিত্রা আমার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়েছে, আমি তার ওষ্ঠে গালে কপালে পাগলের মতো চুম্বনের পর চুম্বনের রেখা মুদ্রিত করে দিয়ে চলেছি।

চিত্রা যখন মুক্তি পেল তখন তার মুখ মৃতেব মতো বিবর্ণ হয়ে গেছে।

একটা চেয়ারের পিঠ চেপে ধরে সে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

চিত্রা।

যান !

চিত্রা খোলা দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

আমার একটা কথা শোনো চিত্রা, তারপর তাড়িয়ে দাও, চলে যাব।

কথা ? যা বলবেন আমি জানি, শোনাবার দাবি ইচ্ছে করে খুইয়েছেন। যান।

শুনবে না ?

না, না, না। আমি লিওনরা নই। আমি দাঁড়াতে পারছি না, পায়ে লাগছে।

সেই দিন যদি আমাদেব দুজনের অদৃষ্টে যে জট পাকিয়েছিল তার সব ক-টি পাক খুলে যেত ! আজ এ বেদনা হয়তো এমন কঠিন, এমন জ্বালাময়, এমন অসহ্য হত না। দূর থেকে দেখতাম তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে সে মিলিত হয়েছে, আমার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে সে সুখী হয়েছে। আমার সমস্ত ক্ষতি, সমস্ত লজ্জা, প্রিয়বিরহের সবটুকু বেদনা, ক্ষণিকের ভুলের জীবনব্যাপী অনুতাপ এ সমস্তই যাকে ভালোবাসি সে সুখী হয়েছে এই সান্ত্বনার কিরণসম্পাতে সহনীয় হয়ে উঠত। কিন্তু তখনও বাকি ছিল।

পরদিন সকালেই রাঁচি ত্যাগ কবলাম।

আমার দুর্ভাগ্য, অমন একটা ঘটনার পরেও আমার আশা-দীপ একেবারে নিভে গেল না। সব আশা তো মিটেছে, কিন্তু চিত্রার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে প্রত্যেকটি ছোটোবড়ো ঘটনা বাববার তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলাম, যদি কোনো আশা এখনও থাকে ! ক্ষীণ হোক আশা আছে, এ সান্ত্বনা ছাড়া যেন বেঁচে থাকাই অসম্ভব মনে হল।

মুহূর্তের ভুল। ওই ভুলটি না করলে চিত্রা একদিন আমার হত। লিওনরার কথা জেনেও সে দিনের পর দিন আমার কাছে সরে আসছিল। একদিন সত্যকার ভালোবাসাব দাবিতে আমার অতীতের দুর্বলতার কথা তুচ্ছ করে দিয়ে চিত্রা একান্তভাবে আমার হত।

আমার হত !

মনে করতেও রক্তস্রোত যেন থেমে যাবাব উপক্রম হল ! চিত্রা আমার হত, আমার এক মুহূর্তে নিজের হাতে সে সম্ভাবনাকে অসম্ভবই হয়তো করে দিয়ে এসেছি !

পনেরো দিন ধবে ভাবলাম আর জ্বললাম। তারপব মনস্থির হয়ে গেল ! চিত্রাব সঙ্গে একটিবার দেখা করে অন্তরের সবটুকু তার সামনে ধরে দেব। যদি আমার নিমেষের ভুলকে ক্ষমা কবে থাকে, চিরজীবনের মতো শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাব। এই স্থির কবার পর আমার মন হঠাৎ আশ্চর্য রকম স্থৈর্য লাভ করল। আশা কেবলই আমার কানে গুঞ্জন কবতে লাগল, সে ক্ষমা কবেছে।

উত্তেজনাব মুখে সে যা বলেছে, সেটা সত্য নয়, তার অন্তরের কথা নয়। তার মন শান্ত হয়েছে, নিমেষের ভুলে যে সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে নেই এ কথা সে এখন বুঝেছে।

যদি অপমান করে ! অপমান ? শুধু চিত্রাকে নয়, নিজের ভালোবাসাকে যদি আমি অত বড়ো অপমান করতে পেরে থাকি, চিত্রার দেওয়া কোনো অপমানকেই তো অপমান ভাববার অধিকার আমার নেই।

আমার তখনকাব মনের ভাব ঠিক করে বর্ণনা কবা অসম্ভব। কত বিবুদ্ধ চিন্তা, কত অসম্ভব কল্পনা, কত যুক্তি, কত তর্ক দিয়ে যে আমি তখন আমার জ্বালা-ভরা অনুতপ্ত মনের অগ্ন্যুত্তপ্ত আত্মগ্লানির তীব্রতা কমিয়ে আনবার চেষ্টা করছিলাম তার সীমা ছিল না।

চিত্রার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মুখ ফুটে একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারব কি না সন্দেহ হল। শেষে চিঠিখানা জোর করে খামে ভরে ফেললাম। মুহূর্তের উত্তেজনা, নিমেষের ভুল ওই সব লিখতে লজ্জা বোধ হল। নিজের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাবার আশা জানিয়ে, সারা-জীবন যে আমি এই চিঠির জবাবের প্রতীক্ষা করব এই কথা লিখে শেষ করলাম। কত কী লিখবার দুর্দমনীয় ইচ্ছা জাগছিল ! মনে মনে বললাম, ভালোই যদি বাসে আমার অকথিত বাণী তার মনের দুয়ারে পৌঁছবে, মুখ ফুটে বলার প্রয়োজন হবে না।

সে চিঠি তাকে দেওয়া হয়নি। এই পাষাণ-ভরা নদীগর্ভে সে চিঠি হারিয়েছে। তার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি অক্ষর যে এখনও কেঁদে বেড়াচ্ছে, এখানে এলেই আমি স্পষ্ট অনুভব করি।

জগদীশ থেমে গেল। তার চোখে জল নেই, কিন্তু মনে হল, তার চোখের অন্তরালে অনলকণা আর অশ্রুধারা একসঙ্গে বর্ষিত হচ্ছে।

প্রায় দশ মিনিট নিঃশব্দ থেকে জগদীশ আবার শুরু করল।

রাঁচি ফিরলাম। স্টেশন থেকে সোজা চিত্রাদের বাড়ি গেলাম। কেউ বাড়িতে নেই। চাকর জানাল, সকলে হুড্রু গেছে।

হুড্রু রওনা হলাম। চিত্রার পায়ে ব্যথা, এই ক-দিনে কমলেও হয়তো সে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে প্রপাতের নীচে নামতে পারবে না। মি. সেন আর মিসেস সেন যদি প্রপাতের সৌন্দর্য দেখতে নীচে নামেন, চিত্রা একা থাকবে। সেই হবে আমার সুযোগ। প্রকৃতির উদারতার ছাপ লাগবে চিত্রার মনে।

চারিদিকের শান্ত কোমলতা তার অন্তরের কাঠিন্য গলিয়ে দেবে।

তিনজনে এক পাথরে বসে চা পান করছিলেন, আমি দূরে এক পাথরের আড়ালে বসে চেয়ে রইলাম। আধঘণ্টা পরে দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে মিস্টার সেন আর মিসেস সেন নীচে চলে গেলেন।

চিত্রা উঠে ধীরে ধীরে প্রপাতের মুখের দিকে অগ্রসর হল।

মিনিট দশেক চুপচাপ বসে থেকে জোর করে উঠে পড়লাম। একটা উঁচু পাথরে উঠে নজরে পড়ল ঢালের ধারে বসে চিত্রা নীচের দিকে চেয়ে আছে।

পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে চিত্রা চমকে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে ভীত বিবর্ণ মুখে আমার দিকে চেয়ে রইল। বুঝলাম এই নির্জনে অকস্মাৎ আমার আবির্ভাবে চিত্রা ভয় পেয়েছে ! বুকপকেট থেকে চিঠিটা বার করতে করতে দু-পা অগ্রসর হয়ে বললাম, চিত্রা—

অস্ফুট শব্দ করে চিত্রা সভয়ে পিছিয়ে গেল। দাঁড়িয়েছিল একেবারে ধারে। হঠাৎ চিত্রা এক নিমেষে আমার দৃষ্টিপথ থেকে মুছে গেল।

তারপর নিকষকালো অন্ধকারে বিশ্ব ঢেকে গেল। যখন সংজ্ঞা ফিরল তখন—তখন—

শেষের দিকে জগদীশের কণ্ঠ ক্রমেই বিকৃত এবং অস্পষ্ট হয়ে উঠছিল ; হঠাৎ সে সেই পাথরের ওপরেই ঢলে পড়ল। মুখের দিকে চেয়েই বুঝলাম সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।

আর একটি কথা বললেই এ কাহিনি শেষ হয়। চিত্রা জগদীশকে ভালোবাসত।

আমার পাঠক বিশেষত পাঠিকারা, প্রশ্ন করবেন, কী করে জানলে ?

সেই জলধি রায়। জগদীশের মুখ থেকে তার জীবনের এই শোচনীয় কাহিনি শোনার প্রায় পাঁচ বছর পরে জলধির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কী সূত্রে পরিচয় হয়েছিল, বলবার প্রয়োজন নেই।

জলধি চিত্রাকে ভালোবাসত। যেদিন সে তার মনের কথা চিত্রাকে জানায়, চিত্রা ব্যথিত হয়ে তাকে জগদীশের কথা বলেছিল।

ক্ষণিকের দুর্বলতায় জলধি জগদীশের ইউরোপ প্রবাসকালের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা জানাতে চিত্রা বলেছিল, সে আমি জানি জলধিবাবু। এ জীবনে আমাদের মিলন সম্ভব হবে কি না ঈশ্বর জানেন। সত্য ভালোবাসা যদি তার বুকে জাগে, ধরা দেব। আর যদি আমার রূপটাই তার কাম্য হয়ে আমার ভালোবাসার অপমান করে তো তার সেই কামনা আমি কোনোদিনই মেটাব না।

দূর আকাশের দিকে স্বপ্নের দৃষ্টি মেলে বলেছিল, তাঁর ভেতরে বড়ো দ্রুত পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে জলধিবাবু। আমার ভালোবাসা ব্যর্থ হবে না, একদিন আমার রূপকে নয়, আমাকে তিনি ভালোবাসবেন।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

জগদীশের বন্ধুর মুখে না বলিয়ে কাহিনিটা এবার আমি নিজেই বলে যাই।

কত দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ জগদীশের জীবনের এই ট্র্যাজেডি। জীবন ও জগৎ কত দিক দিয়ে অস্বীকৃত !

যে বলছে জগদীশের জীবন-কাহিনি, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের যে মানুষটা ছেলেবেলা থেকে ধনীর ছেলে জগদীশের সব চেয়ে আপন, একমাত্র বন্ধু— বাপের টাকায় চরম উচ্ছৃঙ্খলায় বিদেশ চষতে বেরোবার সময় জাহাজে উঠবার আগে যার কাছে বিদায় নিতে জগদীশ কেঁদে ফেলেছিল--- সে এই কাহিনিতে আছে কীভাবে ?

জগদীশের কাহিনিকে করুণরসে ফেনাবার জন্যই যেন তার মানুষ হয়ে জন্মানো, তার হৃদয়-মনের কারবার যেন শুধু সেইটুকু চিন্তা-ভাবনা অনুভূতি নিয়ে যা স্বদেশি ও বিদেশি বিকারে উন্মাদ জগদীশের সত্যিকারের ভালোবাসার মারাত্মক ট্র্যাজেডিকে ফেনায় !

সে এম এ পাস করে চাকরি নিয়ে অল্পবয়সি একটি মেয়েকে বিয়ে করে সাধারণ সংসারী মানুষ হয় শুধু বেপরোয়া হন্নছাড়া বন্ধুর অসাধারণত্বকে, অস্বাভাবিকত্বকে প্রকট করতে।

হুড়ুর জলপ্রপাতে যে নাটকীয় দুর্ঘটনায় জগদীশের প্রেমের সমাধি সে ঘটনা যতই অসাধারণ হোক, একেবারে ধারে দাঁড়িয়েছিল বলেই জগদীশের আকস্মিক আবির্ভাবে শুধু এক পা পিছোতে গিয়ে ভীরু চিত্রা চারশো ফিট নীচে আছড়ে পড়েছিল বলেই ঘটনাটা উদ্ভট অঘটন নয়। এ তো শুধু প্রতীক ঘটনা।

ভাঙাচোরা বাড়ির রেলিংহীন ছাদে দম ছাড়তে গিয়ে ছাদের ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখার সময় মুখ ফিরিয়ে আচমকা মাতাল গুন্ডা প্রিয়তমকে এগিয়ে আসতে দেখে ভয়ে এক পা পিছিয়ে যেতে চেয়ে নীচে আছড়ে পড়ে মৃত্যুতে মিলিয়ে যাওয়াও তো একই ঘটনা।

জগদীশ ছিল শিক্ষিত মার্জিত মাতাল গুন্ডা। তার অতীত জীবনকে ঘৃণা করেও, তাকে ভয় করেও চিত্রা যে তাকে ভালোবেসেছিল সে দোষ চিত্রার নয়। এইভাবে ভালোবাসতেই তাকে শেখানো হয়েছিল মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হবার দিন থেকে।

যে শেখানো ভালোবাসার আদি-অন্ত ব্যাখ্যা করতে ফ্রয়েড থেকে তথাকথিত কত বড়ো বড়ো পণ্ডিত হিমসিম খেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন।

পরদিন সকালেও পাখির কিচিরমিচির ডাকেই প্রবোধের ঘুম ভাঙে

কিন্তু আজ আর তার মনে হয় না যে জীবনে এই প্রথমবার পাখির ডাকে সে জাগল।

জগদীশ অচেতন হয়ে চাটাই-শয্যায় তারই পাশে পড়ে আছে। লুকিয়ে খায়নি। তারই সামনে তৈরি করেছিল অচেতন হয়ে ঘুমানোর দাওয়াইটা।

দেশি-বিলাতি মদ, মহুয়া এবং তারই সঙ্গে আফিং !

ঘুমানোর এই দাওয়াই বানিয়ে খাওয়ার আগেই সে শুরু করেছিল আত্মাকে ধোঁয়ায় মিলিয়ে-মিশিয়ে কাবু করার প্রক্রিয়া। গড়গড়া লাগেনি। হুঁকো লাগেনি। শুধু পুরানো এক টুকরা গামছার ন্যাকড়া। কলকের তলায় লাগিয়ে দুবার তিনবার বুকভরে প্রাণভরে টান দিয়ে সমাপ্ত করা।

ছাপোষা মানুষ প্রবোধ। তার কাছে জীবন আর জগতের মানে বউ আর ছেলেপিলেদের পুষে বাঁচার লড়াই মরিয়া হয়ে চালিয়ে যাওয়া।

চোখ কপালে তুলে সে বলে, মদ-গাঁজা-আফিম একসঙ্গে চালাচ্ছিস ?

অত্যধিক জীবন্ত অত্যধিক প্রাণবন্ত জগদীশ এতক্ষণে এবার প্রথম মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, ব্যথা অনেক রকম। অনেক রকম ওষুধ দরকার।

আমিও একটু ওষুধ খাই তবে। আমার ব্যথাও কম নয়। তোর জন্য পোস্টাপিসে জমানো ক-টা টাকা তুলে এনেছি বলে শুধু বাপান্ত করতে বাকি রেখেছিল।

প্রবোধ বিলাতি মদের বোতলটা তুলে জগদীশের বিক্ষিপ্ত নেশা-মেশানোর কাচের খালি গেলাসটাতেই অনেকখানি ঢালে।

চুমুক দেবার আগে বলে, এ ওষুধে ব্যথা সত্যি কমবে তো ?

জগদীশ তার গেলাস-ধরা হাত চেপে ধরে।

রাগের বশে ঝোঁকের বশে অভিমান করে এ সব খেতে নেই ভাই। সামলাতে পারবি না। আমি কী রকম মনের জোর খাটিয়ে ব্যথাটা সওয়ার মতো করার জন্য আস্তে আস্তে নেশাটা রপ্ত করেছি তুই ধারণাও করতে পারবি না। দেখলি না যোগী-ঋষির মতো কী রকম আমায় ভয় করে ? যা বলি তাই শোনে ? কিন্তু প্রবোধেরও আজ একটা অদ্ভুত মরিয়া ভাব জেগেছে। জগদীশের তাগিদে আপিস আর ভাড়াটে বাড়ির ধরাবাঁধা জীবন থেকে ছুটি নিয়ে এসেছে ক-দিনের জন্য—আজ মনে হয় তার নিজের তাগিদও কি কম ছিল ?

জগদীশের তাগিদ পৌঁছানোমাত্র এই সুযোগে দু-চারদিনের জন্য মুক্তি পাবার লোভে তার মনও কি কম চঞ্চল হয়ে উঠেছিল ?

এ হিসাবও সে কি কষেনি যে এমনি তার একা কোথাও বেরোনো অসম্ভব, রেবা আর ছেলেমেয়েদের কাছে নিজেকে অতখানি স্বার্থপর প্রতিপন্ন করার সাহস তার নেই।

একা-একা দু-চারদিন বেরিয়ে আসার দাম দিতে আর সুদ কষতে বাধ্য করে ওরাই তাকে নাজেহাল করে ছাড়বে।

কিন্তু জগদীশের ব্যাপার রেবা জানে। জগদীশের জরুরি আহ্বানে একা বেরিয়ে পড়তে চাইলে ওরা কিছু মনে করতে পারবে না।

সেভিংস ব্যাংকে জমানো সামান্য ক-টা টাকা তুলেছে টের পেয়েই কী কাণ্ড রেবা জুড়েছিল !

দেখি না খেয়ে। তুই তিন-চাররকম মিশিয়ে খাচ্ছিস, তোর সয়ে যায়, কাজে লাগে, আমি কি মানুষ নই ? দেখি না এক রকম খেয়ে কী হয়। মরি তো নয় মরব !

বিলাতি বোতল থেকে নিজেই মদ ঢেলেছিস গেলাসে। জীবনে কখনও মদ খায়নি, তামাক সিগারেট টানেনি। সর্দি হলে দু-একটিপ নস্য নিয়েছে।

জগদীশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এক চুমুকে সে গেলাসের মদটা গিলে ফেলে।

গিলতে কষ্ট হয়। গেলার পরেও এমন ভয়ানক কষ্ট হয় যে তার চিরদিনের আয়ত্ত করা রাগ পর্যন্ত যেন বিগড়ে যেতে চায়।

জগদীশের গালে একটা চড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছা হয় !

জগদীশের অভ্যস্ত নেশার মর্ম বুঝতে খাবি খেতে খেতে বিলাতি বোতলের নেশাটুকু শুধু খানিকটা দুঃসাহসী পাল্লা দেবার বাহাদুরি দেখাতে গিলে ফেলে প্রবোধ দু-চারমিনিটের জন্য চুপ হয়ে যায়।

মাথা ঘুরতে আরম্ভ করলে চুপ না হয়ে উপায় কী !

জগদীশ বলে, ভাই বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই। তুই বিয়ে করা বউ নিয়ে বাঁচিস। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। তুই যা বলিস যা করিস তাই সই। তুই হলি কর্তা। বউ-ছেলেমেয়ে ঝি-চাকরের মতো

তোর কথায় ওঠে-বসে। তুই কী বুঝবি ভাই আমার প্রাণের জ্বালা ? তুই কী বুঝবি কেন আমি চিত্রাকে চিরজীবনের সাথি করে নিতে চেয়েও যাচাই করে দেখতে গিয়েছিলাম, সে আমার চিরজীবনের সাথি হবার মতো মেয়ে কি না। ভুল করেই গিয়েছিলাম সত্যি কিন্তু চিত্রাই বা আমাকে এমন ভুল বুঝবে কেন, নিজে ভুল করবে কেন ? চিত্রাও তো দিনের পর দিন আমায় যাচাই করেছিল ! আমার ভালোবাসা ধোপে টিকবে কি না, দুদিন পরে তাকে চেবানো আখের ছোবড়ার মতো ত্যাগ করব কি না, বুঝতে চাইছিল।

মাথা ঘোরা থেমে গিয়ে কষ্টবোধ কেটে গিয়ে নিজেকে প্রবোধের তখন অদ্ভুত রকম তাজা মনে হচ্ছিল।

তার মতো বুদ্ধি আর বোধশক্তি এ জগতে কারও আছে সে ভাবতেও পারছিল না।

তোকে ভালোবেসেছিল বলেই যাচাই করতে চেয়েছিল।

সেটাই তো মস্ত ভুল। ভালোবাসব—তবু যাচাই করব, এ ইয়ার্কি চলে না। ভালোবাসা খেলার ব্যাপার নয়। দু-পক্ষের যাচাই করা আগেই হয়ে যায়, নইলে ভালোবাসা জন্মে না। ভালোবাসা জন্মাবার পর আর কি যাচাই করা চলে কীসে কী হবে ? সন্তান জন্মাবার পর মা-বাবার কি হিসাব করা চলে বাচ্চাটাকে রাখব না ফেলে দেব ? কানা হোক, খোঁড়া হোক, সারাজীবন জ্বালিয়ে মারবে বোঝা যাক—সন্তানকে মানতেই হবে।

অনভ্যস্ত নেশার আকাশে উঠে না গেলে প্রবোধ টের পেত, এ জগদীশ তার ছেলেবেলা থেকে চেনা জগদীশ নয় !

গোটাচারেক সিদ্ধ করা মুরগির ডিম দিয়ে যায় সেই মেয়েটা। জগদীশ যেন পিতার মতোই উদারভাবে তার গালটা টিপে দেয়। ক্রমে ক্রমে জগদীশের ব্যক্তিত্ব যেন বনের ধারের এই নির্জন কুটিরে বসে মানস প্রসারিত করে আয়ত্ত করছিল জীবন আর জগৎ—যেন তারই নির্দেশে তারই নিয়মে তারই পরামর্শে জগৎ আর জীবন চলে, জীবনের মানে যেন সেই শুধু জানে।

মরিয়া হয়ে প্রবোধ বিলাতি বোতলটা আরেকবার একটুখানি কাত করে তার গেলাসে। অল্পই ঢালে—এত অল্প ঢালে যে জগদীশের আমোদ পাওয়া নীরব হাসি তার মুখেও হাসি ফুটিয়ে তোলে।

বোতলটা টেনে নিয়ে গলায় কাত করে জগদীশ আবার হাসে। বলে, আসল ভুলটা আমাদের দুজনেরই হয়েছিল এক—ভালোবাসাকে না মেনে যাচাই করতে চাওয়া। আমি আরেকটা মারাত্মক ভুল করেছিলাম। সেটা আমার দোষ। সেই জন্যই তো নিজের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। আর বাঁচতে ভালো লাগে না।

অনভ্যস্ত নেশা তীক্ষ্ণ করে দিয়েছে প্রবোধের বুদ্ধি, একেবারে চাঁছাছোলা বুদ্ধি করে দিয়েছে কিছুক্ষণের জন্য, সে ভাবে, এ তো ভারী সমস্যার কথা হল।

বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে বলে, আর বাঁচতে ভালো লাগে না বলে জগদীশ এ রকম নেশা করে—অথবা এ রকম নেশা করে বলেই তার জীবনে বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে, বাঁচতে আর ভালো লাগে না ?

সে কিছু বলবে, ভেবেছিল জগদীশ। কথা না বলে সে ভাবতে শুরু করায় জগদীশ বিরক্ত হয়ে ওঠে !

প্রবোধ নিশ্চয় নিজের সমস্যার কথা ভাবছে।

তার বউ-ছেলেমেয়ের কথা।

কিন্তু বিরক্ত হয়ে রাগ করে লাভ নেই !

এই প্রবোধকেই তাকে বলতে হবে তার প্রাণের কথা।

স্থানীয় যে ক-জন অসভ্য আদিম মেয়েপুরুষ তাকে যোগী-ঋষির সম্মান দেয় তাদের এ সব কথা শোনানোও অর্থহীন।

তারা অর্থই বুঝবে না তার কথার।

চোলাই আর মহুয়া বেশিমাত্রায় চড়িয়েছে ভেবে দুদিন চোলাই আর মহুয়ার বদলে শুধু দুধ আর ফল দেবে, ডিম আর আতা-পেয়ারা ফল দেবে !

# তৃতীয় অধ্যায়

কী দ্রুতগতিতেই যে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে সাধুবাবা জগদীশের নাম। জগদীশ নামটা নয়। সাধুবাবা নাম। জোয়ান বয়স, এমন টকটকে গায়ের রং। মুখ দেখলেই বুঝতে পারা যায় রুক্ষতাটা গায়ের জোরে টেনে আনা হয়েছে, বোধ হয় তার যোগসাধনার প্রক্রিয়া দিয়েই।

ছাই-চাপা আগুনের মতোই তার মুখে উঁকি-ঝুঁকি মারে রাজপুত্রের রূপ।

নেশা আর উচ্ছৃঙ্খলতার এত বাড়াবাড়ি এতকাল ধরে চালিয়ে এসেও একেবারে ধ্বংস করে ফেলতে পারেনি বহুপুরুষ ধরে গড়া তার দেহের বুনিয়াদি বনেদ।

তার বাপের বেলা পর্যন্ত চলে এসেছে শুদ্ধ সাত্ত্বিক কঠোর নিয়মতান্ত্রিক আত্ম-অপচয়—মদ বেশ্যা বাইজি পার্ষদ তারা বরাবর কনট্রোল করে এসেছে শাস্ত্রীয় সংযমে।

শোষণটা ঠিক রাখার জন্যই এই সংযম।

শোষণের এই সংযমী গরিয়সীতাই কত শতাব্দী ধরে ভাবুক শান্ত সাধারণ শোষিতকে মোহিত দমিত আর ভীরু-কাপুরুষ করে রেখে এসেছে।

জগদীশ ভুলে যায়নি।

একটা শোচনীয় দুর্ঘটনায় চিত্রা জলপ্রপাতে আছড়ে পড়ে তলিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে বলেই কি আর নিজের অতীত জীবনকে জগদীশ ভুলতে পারে ?

মা-কে জড়িয়ে ধরে শুতো জগদীশ। মা-ও তাকে জড়িয়ে ধরে শুতো।

রাত একটা দুটোয় বাবা বাড়ি ফিরলে মা কিন্তু কত যত্নে কত সন্তর্পণে মা-ছেলে তাদের দুজনের জড়াজড়ি করে ঘুমানোতে ছেদ টেনে উঠে যেত।

মা ভাবত, তার বুঝি ঘুমই ভাঙেনি।

মা-র জন্য তাকে করতে হত ঘুম ভেঙেও ঘুমিয়ে থাকার ভান।

ঘুমের ভান করা মাথাটা রাগে দুঃখে অপমানে জ্বলে যেত জগদীশের।

মা জিজ্ঞাসাও করত না : বেশ্যা-পার্ষদ-বাইজিদের জন্য ফিরতে রাত হল কি ?

মা শুধু বলত, কিছু খাবে কি ? মাছ মাংস ডিম পরোটা সব তৈরি আছে।

মাছ খাব। কী মাছ আছে ?

খাড়া আছে, ইলিশ আছে, গলদা চিংড়ি আছে। ঝাল আর ঝোল দুরকমই আছে। আর তুমি যে পুঁটিমাছ ক-টা ধরেছিলে, সেগুলো ভাজা করা আছে।

জগুকে দাওনি পুঁটি ক টা ? ওর ছিপে ধরা মাছ ! এক একটা মাছ তুলি, ওর কী ফুর্তি ! ওকে না দিয়ে মাছগুলি আমার জন্য রেখে দিয়েছ ? ছিছি !

আমি কী জানি ? বললে ওকেই দিতাম। পরশু এইটুকু একটা মিরগেল ধরেছিলে, কাঁটায় ভর্তি। তিন রকমের ভালো মাছ রাঁধা হয়েছে, কাঁটা-ভর্তি ওইটুকু মাছ তুমি কি আর খাবে ভেবে—

ওইটুকু মাছ ? আধসেরের চেয়ে ছোটো মাছ তুললে সে মাছ আমি আনি ? জলে ছুঁড়ে ফেলে দি।

আধসেরি মাছ মস্ত মাছ ! তাও আবার মিরগেল। কাঁটা বাছতে বাছতে পিত্তি পড়ে খিদে নষ্ট হয়ে যায়। কানুর মা প্রসাদ দিতে এসেছিল, মাছটা আমি তাই ওকে দিয়ে দিলাম, পুঁটি মৌরলা ছাড়া বেচারার একটু মাছ জোটে না। রাতে বাড়ি ফিরে তুমি এক ঘণ্টার বেশি আমায় বকলে।

বকলাম ? মিছে কথা বোলো না। আমি শুধু তোমায় বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম নিজের ধরা মাছের কাছে কোনো মাছ লাগে না। জগাকে পুঁটিগুলো দিলে না, ভালো ভালো দামি দামি মাছ দিয়েছ বলেই কি ওর মনে কম কষ্ট হয়েছে ভেবেছ ? ওর ছোটো ছিপে ধরা মাছ, নিজে পাঁচ-ছটা তুলেছিল। পুঁটি তোলার কায়দা তো বেচারা জানে না, হঠাৎ একটা তুলতে পারে তো দশটা ফসকে যায়। কী রকম আকুল হয়ে ও আমাকে ওর ছিপে মাছ ধরতে বলেছিল জানো ? সেই মাছ তুমি ওকে খেতে দিলে না ! সোজা কথা বুঝবে না, বুঝিয়ে দিতে গেলে ভাববে বকছি !

বকছই তো। কালও বকেছিলে, আজও বকছ।

কাল একটা কড়া কথা বলেছিলাম তোমায় ? আজ একটা কড়া কথা বলেছি ? জগার মনে কষ্ট দিয়েছ তবু একবার তোমায় আমি গলা চড়িয়ে একটা কথা বলেছি ?

ওকেই বকা বলে—গলা চড়াতে হয় না, গাল দিতে হয় না। রাতদুপুরে একটা সোজাকথা বোঝাতে এক ঘণ্টা লেকচার ঝাড়লে সেটা বকাবকি গালাগালির বেহদ্দ হয়। কাল বোঝালে এক রকম—নিজের ধরা মাছের কাছে কী অন্য মাছ !

জগা পুঁটি খাবার আবদার ধরল—তোমার উচিত কথার লেকচার শুনবার ভয়ে আমি ওকে দু-চারটের বেশি দিতে বারণ করলাম। মাছ মাংস ডিম কত রকমের রাঁধা আছে—রাতদুপুরে বাড়ি ফিরে তুমি হয়তো নিজের ধরা ওই পুঁটির শোকে তিন ঘণ্টা লেকচার ঝাড়বে। বাড়ির রাঁধুনির সামনেই অপমানের একশেষ করবে। সেই লেকচার ঝাড়ছ—জগাকে পুঁটি দিইনি বলে ! রাতদুপুরে এক ঘণ্টা ধরে না বুঝিয়ে বেরোবার আগে দুটো কথা বলে গেলেই হত—পুঁটিগুলো জগাকে দিয়ো ! আমি কথা কইলে তুমি বিরক্ত হও বুঝি ? আমার সঙ্গে কথা বলতেও তোমার ইচ্ছা করে না ?

যতক্ষণ তোমার ঘুম না আসে, যতক্ষণ কথা বলো—ঘুমে মরে গেলেও কথা কই না ? কথা থামিয়ে নিজে ঘুমোবার আগে কোনোদিন ঘুমোতে দেখেছ আমায় ? দুপুররাতে কথা কয়ে কয়ে বকুনি সয়ে সয়ে তোমায় ঘুম পাড়িয়ে তবে আমার ঘুমোনোর ছুটি মেলে।

ডাকাত গুন্ডা প্রজাগুলোকে ঠেকিয়ে বিষয়-সম্পত্তি বজায় রাখা, এদিকে কর্তাদের মন রাখা আর ওদিকে যারা প্রজা খেপিয়ে কর্তাদের ঘায়েল করতে চাইছে তাদের সামলে চলা—এ বুঝি মেয়েলি কাজ ভেবেছ তুমি ? এ কাজে হাঙ্গামা নেই, খাটুনি নেই ? দিনকাল বদলায়নি ? অন্যের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বাবার মতো ডাঁট হয়ে মদ খেয়ে সব বজায় রাখতে পারছি ভাবছ বুঝি ? দায়টা ঘাড়ে নিয়ে তুমিই চালাও না এবার থেকে। আমি বেহাই পাই।

তোমার দায় নেওয়ার মানে জানি। মেয়েমানুষ বলেই অত বোকা ভেবো না আমায়। তোমাদের তো একটা বংশের জমিদারি। বাপ দিয়ে গেল ছেলেকে, ছেলে সব খুইয়ে শেষ করে দিল। আমার ঠাকুর্দারা তিন শরিক হয়েছিল, আজও তারা দায় সামলাচ্ছে। আমার মামারা পাঁচ শরিক হয়ে এখনও—

তোমার মামারা জোতদার।

তুমিই বা ক-দিন আর জমিদার থাকবে ? রামলালজির দেনাটাই শুধতে পারছ না জমিদারি চালিয়ে। চাইতে চাইতে ঘেন্না ধরে গেল, নয়া ফ্যাশনের সাতনরি হার একটা দিতে পারলে না আজ পর্যন্ত। ললিতবাবুর বউকে চাইতে হয়নি—নিজেই দিয়েছে।

তোমার খালি নালিশ আর নালিশ। আমি আজ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম জানো ?

ওমা, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে ? কোথায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে ? কেন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে ? কী সর্বনাশের কথা ! এতক্ষণ বলোনি আমায় ? তুমি বরং শুয়ে পড়ো, খেয়ে কাজ নেই। পাংখাটা বন্ধ করে দিতে বলি, কেমন ? ছোঁড়াটার নাকি পাংখা টেনে টেনে বুকে কী রকম একটা ঘা হয়েছে—খালি কাশে আর রক্ত তোলে। ওর মা এসে আজ পাংখা টানছে। আমার সন্দেহ হয়েছিল,

আমি বুঝেছিলাম ওর ছেলেটার নিশ্চয় যক্ষ্মা হয়েছে। আমি কিন্তু ওদের কথা দিয়েছি, বাবু সব ঠিক করে দেবে। ওর মা তাই ছেলের হয়ে পাংখা টানতে এসেছে। কী বলব বলো তো ওকে ? না না, তোমায় উঠতে হবে না, তোমায় কিছু করতে হবে না ! আমায় শুধু এক কথা বলে দাও কী করতে হবে। ওকে ছুটি দিয়ে দি ? কী বিশ্রী লাগছে পাংখার হাওয়া। এ হাওয়ায় তোমার ঘুম আসবে না। পাংখা টানা বন্ধ করে বেচারাকে ঘরে যেতে বলছি ! যতক্ষণ না ঘুমোও হাতপাখা দিয়ে মাথায় হাওয়া করব।

এই কথার নাটকের মধ্যে কখন কোন সময় ঘুমিয়ে পড়ত জগদীশ তার নিজেরই খেয়াল থাকত না।

কথাগুলি অবিকল মনে নেই। থাকা সম্ভবও নয়। কথা কাটাকাটির মোট মানে আর ধরনটা শুধু মনে আছে।

ভদ্রভাবে শান্তভাবে তাদের দীর্ঘ কলহের পালা চলত। অল্পবিস্তর মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেও ধূর্জটি কোনোদিন মন্দাকিনীকে গলা চড়িয়ে একটা ধমক দিয়েছিল কি না জগদীশ স্মরণ করতে পারে না।

মন্দাকিনীর জন্য গভীর মমতা ছিল ধূর্জটির। তার মধ্যে ফাঁকি ছিল না—সে দরদ ছিল আন্তরিক। অজস্র অসংখ্য খুঁটিনাটি প্রমাণে এ সত্য সন্দেহাতীত হয়ে আছে।

প্রথম বয়সে, সংসারের হালচাল বুঝে উঠতে আরম্ভ করার সময়, মাঝে মাঝে দু-এক পেগ মদ খেতে শুরু করার সময়, জগদীশ ভেবেছিল, মা-র জন্য তার বাবার ওই মমতাই তাকে অসংযত হতে দিত না।

ঠাট বজায় রাখতে হত। পার্ষদ নিয়ে মদ্যপানও চলত, বাইজিও নাচত। কিন্তু ধূর্জটি কোনোদিন বেহুঁশ অভদ্র মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরত না।

ক্রমে ক্রমে টের পেয়েছিল ধূর্জটির ওই সংযমের কারণ ছিল মন্দাকিনীর জন্য তার মমতা নয়, ভয়।

মন্দাকিনীর ভাইদের কাছে, জগদীশের মামাদের কাছে, তার ঋণ জমেছিল পাহাড়ের সমান, প্রয়োজন ছিল আরও ঋণের। মন্দাকিনীকে চটাতে সে সাহস পেত না।

টানটা ছিল খাঁটি।

বোধ হয় সেই জন্যই ও রকম ভদ্রভাবে মার্জিতভাবে মাঝরাতে একটানা উপদেশ ঝেড়ে শাস্তি দেবার, গায়ের জ্বালা জুড়োবার প্রয়োজন হত।

মমতা আছে কিন্তু ভয় করতে হয়। একদিন মাতলামি করলে অসভ্যতা করলে মন্দাকিনী সোজা ভাইদের কাছে, নয় মামাদের কাছে চলে যাবে।

তাই দরকার ছিল সংযমের।

সেও কি চিত্রাকে ভয় করত বলেই জীবনে প্রথম অনুভব করেছিল সংযমের প্রয়োজন ? তার অসংযমকে চিত্রা কোনোমতে স্বীকার করবে না জেনে সে সংযত হয়েছিল ?

অতীতে সে যা-ই করে থাক সেটুকু মার্জনা করতে চিত্রা রাজি ছিল কিন্তু বাকি জীবনটা সে একান্তভাবে শুধু তারই অনুগত হয়ে থাকবে চিত্রার মধ্যে এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জাগাতে না পারলে তাকে পাওয়ার কোনো আশা ছিল না বলেই কি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হয়েছিল যে চিত্রা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে ?

সেদিন জানা ছিল না জগদীশের।

সন্ন্যাসী না হতে চেয়েও শুধুমাত্র চিত্রার জন্য নিজের ব্যথার পূজাটা প্রচণ্ড আত্মনিগ্রহের প্রক্রিয়ায় চালিয়ে গিয়ে নিজেকে শেষ করে ফেলার উপায় অবলম্বন করলেও এভাবে আত্মহত্যা সম্ভব করতে পারেনি বরং চড়া নেশার কড়া ওষুধে আত্মবিস্মৃতির সাময়িক বিশ্রামটুকু পেয়ে পেয়েই আত্মা তার আত্মরক্ষা করে ফেলতে পেরেছে।

ব্যথার পূজা ? আত্মহত্যা ?

অথবা আত্মরক্ষা ?

চিত্রা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল সত্যই কিন্তু জীবনটা বদলে ফেলার প্রয়োজনেই তারও কি চিত্রাকে ভালোবাসার প্রয়োজন হয়েছিল ?

ওই জীবন আর টানতে পারছিল না, একদিন এক মুহূর্তের ঝোঁকে চিত্রাকে বুকে চেপে ধরার মতোই সহজ বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিনা কষ্টে মরণকে বরণ করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল—এই নির্জনে পালিয়ে এসে তাই বাঁচার চেষ্টা ?

প্রত্যেক দিন বিষ খেয়ে বেহুঁশ হয়। কিন্তু একান্তে বসে চিন্তা করার তো বিরাম ঘটেনি।

আগেই বরং আসল চিন্তার সময় জুটত না, সব সময় ব্যস্ত হয়ে থাকত খুঁটিনাটি ঝঞ্ঝাটের চিন্তায়। এখানে সে সব বালাই নেই। নেশা করে একঘুম দিয়ে উঠে কাজ। শুধু কী ও কেন চিন্তা করা, আসল কথাটা ধরবার চেষ্টা করা।

ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সাধু হিসাবে বেশি বেশি নাম ছড়ানো জগদীশকে বিস্মিত করে, একটু শঙ্কাও জাগায়। কী পরিণতি হবে তাকে সাধক-মহাপুরুষ করে তোলার এই প্রক্রিয়ার যার গতিরোধ করার সাধ্য তারও নেই, একমাত্র পালিয়ে যাওয়া ছাড়া।

তিন দিকে ঘিরে আছে আদিম অসভ্য মানুষের গাঁ, তারাই সব চেয়ে বেশি কাছাকাছি।

তারা জগদীশকে ভয় করে, ভক্তি করে। কিন্তু তারাই শুধু নয়। অন্য মানুষও কৌতূহল মেটাতে আর ভক্তি জানাতে আসে দূরের গ্রাম আর শহর থেকে

গ্রাম থেকে আসে চাষাভুষো মানুষ, তারা বড়োই গরিব আর বড়োই অজ্ঞ। অক্ষর-জ্ঞান আছে, রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারে, এ রকম লোক গ্রাম থেকে আসে খুব কম।

গ্রামের চেয়ে বেশি ভক্ত আসে খোদ শহর থেকে।

শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের মানুষ।

নানারকম অর্ঘ্য ও উপচার নিয়ে আসে—টাকা-পয়সা প্রণামি দিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে চায়।

জগদীশ বলে, টাকা পায়ে ছুঁইয়ো না। ওই মাটির হাঁড়িটাতে ফেলে দাও।

উপদেশ চায়। আশীর্বাদ চায়। পরিত্রাণ চায়। অর্থে-আনন্দে সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ চায়।

জীবনে কত যে ব্যর্থতা আব কত যে ঝঞ্ঝাট মানুষের। কত যে সমস্যা আর কত যে বিপদ।

শান্ত নির্বিকার আত্মস্থ জগদীশকে দেখে মনে হয় না যে সে ব্যাকুল কাতর কণ্ঠের আবেদন নিবেদন শুনছে। রোগশোক দুঃখ-বেদনা, শোকতাপে জর্জরিত সাধারণ মানুষের মর্মন্তুদ কাহিনিই হোক আর হাজারপতির লাখপতি হবার চেষ্টা বারবার বিফল হবার কাহিনিই হোক—সে যেন সমান নির্বিকল্পভাবে শোনে।

দুঃখী মানুষকে করুণা করাও মানস সাধনার অঙ্গ। আত্মা যেন তার ডুবে আছে ধ্যানে-সাধনায়।

চেতনার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র সে যেন কাজে লাগিয়েছে বিব্রত মানুষের কথা শুনে উপদেশ দেবার জন্য।

তাই যদি না হবে, তবে নিমীলিত চোখে এভাবে নিথর নিষ্কম্প হয়ে যোগসাধনায় ডুবে থেকেও কী করে সে প্রত্যেকের কথা শোনে, প্রশ্নের জবাব দেয়, উপদেশ দেয় আর অন্যায় আবদার করলে তিরস্কারে মাথা নুইয়ে দেয় ?

সত্যই তো। একটা কিছু পেয়ে না থাকলে রাজার মতো ধনীর ছেলে এই বয়সে এই জঙ্গলে জংলি মানুষের সঙ্গে অকারণেই কি ডেরা বেঁধেছে !

রবিবার সকাল থেকে ভক্ত সমাগম শুরু হয়।

রবিবার শহরের ভদ্র ভক্তের সমাবেশই হয় বেশি।

হুড্রু বেড়ানো হবে। যুবক সাধক ও মহাজ্ঞানী সাধুকে প্রণাম করাও হবে।

এক রবিবারের ভোরে সপরিবারে আসে প্রতাপ।

কী বিরাট পরিবার !

চার ছেলে। বড়ো তিন ছেলের তেইশটি ছেলেমেয়ে। সাতটি নাতিনাতিনি। বাচ্চাকাচ্চা সমেত আশ্রিত আত্মীয়-আত্মীয়ার সংখ্যা এগারো।

জলপ্রপাত না দেখে এরা অবশ্য ফিরে যাবে না। তবু মনে হয়, বাঙালি যুবক সাধুবাবাকে প্রণাম জানাতেই যেন তারা এসেছে, হুড্রু জলপ্রপাতটা দেখা কলা বেচে যাওয়ার মতোই আনুষঙ্গিক ব্যাপার।

সত্তর পেরিয়েছে প্রতাপের বয়স।

ভ্রূ পর্যন্ত পেকে সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু টের পাওয়া যায় আজও প্রতাপ বিষয়বুদ্ধি, কর্মশক্তি আর সমগ্র পরিবারটির উপর প্রতাপ হারায়নি।

সকলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতাপ কাঁধের উড়ানিটা গলায় জড়িয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানায় জগদীশকে। সোনার একটা মোহর অর্থাৎ সেকালের একটা গিনি তার পায়ে ছুঁইয়ে প্রণাম করে।

জগদীশ শান্তকণ্ঠে বলে, গিনিটা ওই মাটির ভাঁড়ে ফেলে দাও। কেন যে তোমরা আমায় টাকা পয়সা দিয়ে প্রণাম করতে আসো !

প্রতাপ গদগদ ভাষায় বলে, আপনি আমার শেষ সাধু, শেষ গুরু। আর কারও কাছে যাব না। আপনার উপদেশ শুনে যদি বুঝি উপায় নেই—ভেঙে চুরমার করে দেব সংসারটা।

আমি মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে চুরমার তো হয়ে যাবেই। উপায় নেই বলে আমার খাতিরে কোনোমতে এক সাথে আছে। কী অশান্তি, ওরে বাবা, আমার কী অশান্তি !

কপালে চাপড়াতে গিয়ে প্রতাপ ভোরে কেটে আসা কপালের চন্দনের দাগগুলিতে ভাঙন ধরিয়ে দেয়।

টানতে আর পারিনে বাবা। আছে তো মোটে তিনশো বিঘে জমি, গোটা চারেক বাড়ি আর আশি নব্বুই হাজার নগদ টাকা। কারবারটা টানছি বলে কোনোমতে ঠেকিয়ে যাচ্ছি। রোজগেরে ছেলেগুলো পর্যন্ত ছিনে জোঁকের মতো সেঁটে রয়েছে—ভাগটা না মারা যায়। কী অশান্তি, কী অশান্তি !

মুখ ফিরিয়ে একবার সে তাকিয়ে নেয় তার বিরাট বংশের যে মস্ত অংশটা আজ এখানে উপস্থিত আছে।

কোটিপতির ছেলে তুমি, পার্থিব সুখ ছেড়ে যোগী সন্ন্যাসী হয়েছে। তোমার বাবাও ছিলেন মহাপুরুষ, কত হাজার টাকা আমায় পাইয়ে দিয়েছিলেন ঠিক-ঠিকানা নেই। দেশ-বিদেশের জ্ঞান কুড়িয়ে এই বয়সে সংসার ছেড়ে সাধক হয়েছ। আমার অশান্তি কীসে ঘোচে আমায় বলে দিতে হবে বাবা !

তবু জগদীশ মুখ খোলে না, তেমনি নির্বিকার শান্তদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। গিনিটা প্রতাপের হাতে ধরা ছিল, হাত বাড়িয়ে সেটা সে জগদীশের সামনে মাটিতে রাখে।

এবার জগদীশ মুখ খোলে।

তোমার প্রণামি তো আমি নেব না।

কেন বাবা, কী অপরাধ হল ?

প্রণামির জন্য তুমি সোনা এনেছ ! জান না প্রণামি দিয়ে আমি কী করি ? হাভাতে-হাঘরে গরিবদের বিলিয়ে দিই।

প্রতাপ কাতরভাবে বলে, কিন্তু সোনা দিলে কী দোষ হয় সেটা তো ঠিক—

কাকে দেব সোনাটা ? সোনাটা ভাঙাতে গেলে গরিব বেচারাকে চোর বলে পুলিশে ধরবে না ? ক-টা ছাপা কাগজ আনলেই হত, ক-জনকে দিতে পারতাম !

প্রতাপ হাতজোড় করে বলে, তাই নিন দয়া করে—সোনাটাও থাক। এটা বংশের নিয়ম, গুরুকে সাধুকে ব্রাহ্মণকে সোনা ছাড়া প্রণাম করলে অভিশাপ লাগবে।

নিয়মটা নাকি চালু করে গিয়েছে প্রতাপের পিতাঠাকুর। যা ধরত তাই সোনা হয়ে যেত, গুরু তাই হুকুম দিয়েছিল টাকা-পয়সা শুধু ভিক্ষা দেওয়া চলবে—গুরুকে সাধুকে ব্রাহ্মণকে বা মন্দিরে সোনা ঠেকিয়ে প্রণাম না করলে হয়ে যাবে সর্বনাশ।

প্রতাপ ডাক দেয়, খুব মিষ্টিসুরে ডাক দেয়—ছোটো বউমা, পাঁচ টাকার নোট দাও দিকি পাঁচখানা।

রংচংয়ে শাড়ি আর একরাশি গয়নায় জমকালো করে সাজা বিশ থেকে চল্লিশ পেরোনো বয়সের কয়েকজনের পিছনে ছিল ছোটো বউ ললিতা।

নিজেকে স্বেচ্ছায় খানিকটা আড়াল করেছিল।

সামনে এগিয়ে আসতেই তাকে দেখে জগদীশ চমকে ওঠে, কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে যায় যে সে যোগী সাধক, তরুণী কোনো স্ত্রীলোককে দেখে বিচলিত হওয়াটা তার একেবারেই উচিত নয়।

একটু বিহ্বল না হয়েও অবশ্য তার উপায় ছিল না।

জলপ্রপাতে হারানো চিত্রা যেন উঠে এসেছে তার সামনে।

শাড়িটা চিত্রার, চিত্রার মতোই তার দুহাতে দুগাছা শুধু চুড়ি।

গায়ের রংয়ে সোনার চুড়ির এমন মিল যে মনে হয় চিত্রার মতোই এই কারণেই সে বুঝি অঙ্গ থেকে বিসর্জন দিয়েছে আভরণের চিহ্নটুকু।

চিত্রার ছাঁচে ঢালা গড়ন।

সেকেলে উথলানো গড়নটা যথাসম্ভব চাপা দেবার জন্য ঠিক চিত্রার মতোই আধুনিকতম সাজসজ্জার কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে।

তবে মুখ একেবারে অন্য রকম।

তার মুখ দেখে জগদীশ স্বস্তি পায়।

চিত্রার মুখের সঙ্গে শুধু রঙের মিল ছাড়া কোনো মিল নেই।

লালিত্য আছে, কোমলতা আছে, লাবণ্য আছে—কিন্তু সবই যেন আছে মুখের তীক্ষ্ণ কাঠিন্যকে খানিকটা আড়াল করে যতটুকু না রাখলে নয় শুধু ততটুকু মেয়েলি ভাব বজায় রাখার জন্য।

চোখে শান্ত সজাগ দৃষ্টি—বুদ্ধির ধারে শাণিত।

পাঁচ টাকার পাঁচটি নোট গুনতে গুনতেই ললিতা একবার শাণিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে নেয় !

তাকে ঠোঁট কামড়াতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে জগদীশ সামলে নেয়।

একটু হতভম্ব প্রতাপকে সে গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, এই পরম ভাগ্যবতী মা-টিকে তুমি কোথায় পেলে ?

মা-টিকে !

নোট ক-খানা হাত থেকে খসে পড়ে যায় ললিতার।

প্রতাপ মুগ্ধ কৃতার্থ গদগদ হয়ে বলে, আজ্ঞে যা বলেছেন, সব চেয়ে অমানুষ ভেবেছিলাম যে ছেলেটাকে, শেষ পর্যন্ত সেটাই হল মানুষ। পাট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে নিজে কখনও সাহস পাইনি—শুনেছি অনেক ফাটকাবাজি চলে। ছেলেটা যেমন পাজি তেমনি চালাকচতুর। ভাবলাম ওটাকে পাটের লাইনে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখি কী হয়। কথা কি শোনে ? যত বলি, তুই পারিস না পারিস তোর কোনো দায় নেই, বিশ-ত্রিশহাজার যদি যায় তো যাবে। তোকে কিছু বলব না, তুই শুধু একবার কোমর বেঁধে লাগ।

জগদীশ নির্বিকারভাব বজায় রেখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রতাপের কথা শোনে। মনের তোলপাড় ওঠা মুখে যাতে ফুটে না ওঠে সে জন্য রীতিমতো তাকে কসরত কবতে হয়।

ছোটোছেলের নাম আলোক। সে কিছুতে নামবে না পাটের ব্যাবসায়ে, সে পড়বে। পরীক্ষা পাস সে করে সত্যি—কোনো রকমে হলেও পাস করে।

একটি সত্যিকারের বিদ্বান ছেলে সারাজীবন চেয়ে আসছে প্রতাপ। মাথাওলা শিক্ষিত যে সব মানুষ চিবদিন সামনে তোষামোদ করেও মনে-প্রাণে অবজ্ঞা করে এসেছে তাকে, তাদের মতো বিদ্বান একটি ছেলে চেয়েছে।

প্রথমে আশাও করেছিল যে আলোক বুঝি তার স্বপ্ন সার্থক করবে।

কিন্তু কলেজের প্রথম পবীক্ষা পাস কবেও আলোক তাকে টের পাইয়ে দিয়েছিল যে তার বিদ্বান ছেলেব স্বপ্ন সার্থক করার কোনো ইচ্ছাই নেই।

পাস কবল। সেই অজুহাতে উড়িযে দিল বাবার হাজার দশেক টাকা।

ভডকে গিযে প্রতাপ কড়াসুরে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমাব মনের ইচ্ছাটা কী ?

ছেলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, আমি মানুষ হব, বড়ো হব।

সেকেলে চালচলন আমার সয় না।

কৃতার্থ প্রতাপ বলেছিল, আমিও তো তোকে মানুষ করতে বড়ো করতে চাই বাবা ! লাট বেলাটের সঙ্গে তুই সমানভাবে বড়ো বড়ো জ্ঞানের কথা বলবি, ফড়ফড় করে ইংবেজি বলবি, তাই তো আমার সাধ ! তা লেখাপড়ায় মন দিয়ে তো করবি সেটা ? সিগ্রেট খাচ্ছিস, খা। ওটা হয়ে গেছে মুড়ি-মুড়কি, বাচ্চারাও খাচ্ছে। এ বযসে মদ ধবেছিস কেন ? কী করে তুই বড়ো হবি, মানুষ হবি ? উছন্ন হয়ে যাবি না ?

ছেলে বলেছিল, মদ ধরিনি তো ? উপায় না থাকলে ওষুধ গেলাব মতো দু-একচুমুক খাই। বড়ো হব, মানুষ হব,—স্মার্ট ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দেব—সেকেলে গেঁয়ো ভূত হয়ে থাকলে হয় ?

দিন দিন ম্লেচ্ছ হয়ে যেতে লাগল ছেলে, দিন দিন যেন ধাতস্থ করতে লাগল সাহেবি মন মেজাজ।

কাজের মানুষ, অনেক দায়—একটা ছেলের বিষয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামায়, সময় কি আছে প্রতাপের ? খেয়ে উঠে ঝিমিযে ঝিমিয়ে আধঘণ্টা তামাক টানার অবসরটুকু ভরে রইল বিষাদ আর আপশোশে।

কিন্তু উপায় কী ? যে লাইনে এগোচ্ছে, সেই লাইনেই চলতে দিতে হবে ছেলেকে।

ছেলে কিন্তু মান রেখেছে তার।

কত কাণ্ড করে বিলেত-টিলেত ঘুরে দেড় হাজার টাকার চাকরি বাগিয়েছে, লাটবেলাটদের মহলে তার চলাফেরা।

আজও কিন্তু প্রতাপকে সে বাপের সম্মান দেয়, পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম পর্যন্ত করে।

ললিতাকে সে বিয়ে করেছিল তাকে কিছু না জানিয়েই, রেজিস্টারি আইনে বিয়ে করেছিল। কিন্তু বাপকে সে বলেছিল স্পষ্ট করেই, ইচ্ছা হলে তোমার মতেই আবার আমাদের বিয়ে দাও না ? ধরে নাও না বিয়ে আমাদের হয়নি ? তুমি চাইলে টোপর পরে বর সেজে আবার আমি ওকে বিয়ে করব।

গরিব মামা ছাড়া কেউ নেই ললিতার।

অনেক ভেবে-চিন্তে ছেলের বিয়েটা প্রতাপ মেনে নিয়েছিল, বউ-ভাত দিয়েছিল সমারোহ করে। আত্মীয়স্বজন জানাচেনা যে যেখানে ছিল সকলকে আনিয়েছিল।

ভেবেছিল হাজার পাঁচ-ছয়ে কুলিয়ে যাবে, খরচ হয়ে গিয়েছিল তেরো হাজারের উপর।

রেগে টং হয়ে গিয়েছিল বড়োছেলেরা আর তাদের বউরা।

প্রায় বেধে গিয়েছিল একটা ভীষণ রকম গৃহযুদ্ধ। কত কষ্টে কী কৌশলে যে প্রতাপ সামলে নিয়েছিল বিপদটা।

ভেবে-চিন্তে রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল।

চিৎকার করে বলেছিল, আমার বুঝি কোনো শখ নেই, সাধ আহ্লাদ নেই ? তোমার বাজে খেয়ালে হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে দেবে, একটা ছেলের বিয়েতে একটু আনন্দ কবব তাও তোমাদের সয় না ? কালই আমি উইল করে সবকিছু বিলিয়ে দেব। পরশু কাশী চলে যাব।

সবাই ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল।

তারপরে কঠিন অসুখ হয়েছিল প্রতাপের। এক মাস শয্যাগত হয়েছিল। ললিতা নিয়েছিল টাকা-পয়সা আদান-প্রদানের হিসাবনিকাশের ভার, আর তিনজন ম্যানেজারকে সামলাবার ভার। রোগশয্যা থেকে উঠে কাজকর্ম হিসাবনিকাশ দেখতে বসে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল প্রতাপ।

একটা মাসেই তার মোট লাভের অঙ্ক হাজার পাঁচেক বাড়িয়ে দিয়েছে ললিতা।

হিরের আংটি বা দুল না সোনার হার ?

ললিতাকে কী পুরস্কার দেবে ভাবতে প্রতাপকে রীতিমতো মাথা ঘামাতে হয়েছিল।

ভেবে-চিন্তে ও সব সেকেলে পুরস্কারের প্রথা সে বাতিল করেছিল ললিতার মতো একেলে ছেলের বউ পাওয়ার খাতিরে।

ঘড়ি ধরে নিয়মিত সময়ে ললিতা তাকে ওষুধ খাওয়াতে আসার সময় সে কিছুই বলেনি, শুধু একটু সস্নেহ দৃষ্টিতে তার চোখে চোখে তাকিয়ে খুশির ভাব দেখিয়ে তার হাত থেকে তিতো ওষুধ নিয়ে খেয়েছিল।

পথ্য দেবার সময় বলেছিল, বউমা, তুমি তো আমার ছেলের বাড়া। হিসেবে দেখলাম— ছেলেদের তুমি লজ্জা দিয়েছ বাছা। এই দায়টাই তোমায় আমি দিলাম। এই নাও তোমাব গতমাসের মাইনে।

হিরা বা সোনার গয়নাগাঁটি নয়, ব্যবসায় আসল হিসাবনিকাশ চুরিচামারির ব্যাপার দেখে শুনে মাসে তার পাঁচ হাজার টাকা লাভ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য হাজার টাকার চেক। এবং মাঝে মাঝে এই কাজ করার জন্য প্রত্যেকবার একটি করে চেক পাবে এই প্রতিশ্রুতি !

ললিতা কেঁদে ফেলেছিল।

এমনকী আমি করেছি যে আমায় এত বাড়ালেন বাবা ?

করেছ বইকী। একটা ছেলেকে মানুষ করতে পারলাম না, পয়সা উপায়ের কায়দা শেখাতে পারলাম না। সবার পেছনে শুধু ব্যয়। পাঁচশো টাকা ঘরে আনবে তো উড়িয়ে দেবে হাজার টাকা। পরের মেয়ে ঘরে এসে তুমি আমার আয় বাড়িয়েছ, আমার একমাত্র রোজগেরে ছেলের ম্লেচ্ছ হয়ে যাওয়া ঠেকিয়েছ। তুমি অনেক করেছ মা !

নিজের সংসারটিকে নিয়ে হাজির হয়ে জাঁকিয়ে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতাপ নিজের সংসারেব কাহিনি শোনায়, আবার নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলিও করে। তিন ঘণ্টার উপর !

অন্য ভক্তরা এসে কিছু কিছু প্রণামি দিয়ে প্রণাম করে, এক রকম চুপচাপ বসে আছে।

পাঁচখানা পাঁচ টাকার নোট প্রণামি দিয়েছে প্রতাপ, সপবিবারে সে যদি আসর জুড়ে থাকে একটা বেলা, নীরবে দেখা আর শোনা ছাড়া কীইবা করাব বা বলাব থাকে দু-চারআনা থেকে দু-এক টাকা প্রণামি দেনেওলা তাদের !

জগদীশ নীরবতা ভঙ্গ করে হঠাৎ গর্জন করে ওঠে, তুমি শান্তি পাবে না। তুমি মহাপাপী।

সকলে চমকে ওঠে। অস্ফুট কয়েকটা আওয়াজ শোনা যায় ভয়ের, তারপর শ্বাসরোধ করা নীরবতায় থমথম করতে থাকে ভক্তের আসরটা।

বুড়ো প্রতাপ শুধু চমকায় না, ভয় পেয়ে কঁকিয়েও ওঠে না। নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে সে চোখ বোজে।

অনেককাল অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে সে কারবার করেছে।

সে ব্যাপার জানে।

চারিদিকে চোখ বুলিয়ে এবার ধীর উদাত্ত কণ্ঠে জগদীশ বলে, মানুষের চেয়ে টাকার দাম তোমার কাছে বেশি। নিজের ছেলেমেয়ে বউ নাতিনাতনির সঙ্গে পর্যন্ত তোমার টাকার সম্পর্ক। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা। তোমার কাছে টাকাই সব। ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনের—

জগদীশ থামে। মাঝে মাঝে সে লম্বাচওড়া ইংরেজি কথা বলে, অনায়াসে সহজভাবে প্রায় ইংবেজের মতোই উচ্চারণ করে বলে।

বলতে বলতে থেমে যায়।

তাবপব বিদেশি কথা ক-টার সহজবোধ্য বাংলা তর্জমা করে আবার শুরু করে তার কথা।

বলে, পশ্চিমি ম্লেচ্ছ সভ্যতায় এটাই সব চেয়ে বড়ো পাপ। এই পাপে তুমি ডুবে গেছ, টাকা টাকা করে আজও তুমি পাগল।

লাভ বাগানোটাই তোমার কাছে সার কথা।

সহজভাবে সকলের নিশ্বাস পড়ে। সকলে স্বস্তিবোধ করে।

অন্য কোনো বিশ্রী মহাপাপ নয়—প্রতাপ টাকা বেশি ভালোবাসে এই মহাপাপ ! অনেক টাকা আছে তবু আরও অনেক অনেক টাকা চায়—এই পাপে প্রতাপ মহাপাপী !

প্রতাপ চোখ মেলে যেন খুশির সঙ্গেই বলে, কী করব তবে ?

কী করলে আমার অশান্তি যাবে, সংসারটা টিঁকবে ?

প্রায়শ্চিত্ত করো।

কীভাবে করবো প্রায়শ্চিত্ত ?

বলে দেব, বুঝিয়ে দেব। সারাজীবন পাপ করে এক দিনে কী প্রায়শ্চিত্ত হয়, রেহাই মেলে ?

জগদীশ ইঙ্গিত করে।

মোটা জঙ্গুলে কাপড় পরা কালো মেয়েটা কাচের বড়ো গেলাসে ঘন সবুজ পানীয় এনে দেয়। সবুজ না হয়ে নীল হলে হয়তো ললিতা ভাবতে পারত, জীবন-সমুদ্র মন্থন করা বিষ।

এক চুমুকে গেলাস শেষ করে জগদীশ বলে, ধীরে ধীরে বুঝবার চেষ্টা করো, মরার পরেও সংসার টিঁকিয়ে রাখার দায় তোমার নয়। সংসারটা ছত্রখান হয়ে যাবে বলে আসলে তোমার অশান্তি নয়—তোমার টাকাগুলো নষ্ট হবে বলে তোমার এত কষ্ট।

তোমার এমন মায়া টাকার যে আজ যদি বলি আমি তোমার এ মায়া কাটিয়ে দেব—তুমি আঁতকে উঠবে !

আমি সংসারী মানুষ, পাঁচজনকে নিয়ে সংসারে থেকেই মরতে চাই বাবা—সন্ন্যাসী হতে চাই না !

জগদীশ হেসে বলে, দেখলে ? টাকার নেশা কাটবার কত ভয় তোমার ? ভয় নেই, আমি তোমার প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দিয়ে আসব।

প্রতাপ কৃতার্থ হয়ে বলে, বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন !

তোমার অশান্তি রোগটা সারাতে যাব।

ললিতা ভেবে-চিন্তে জিজ্ঞাসা করে, আপনার ভোগের কী ব্যবস্থা করব ?

জগদীশ হেসে বলে, আমি কি ভোগ করতে যাব ? ভোগের ব্যবস্থা করতে হবে না। এই প্রপাতের জল শুধু রেখো—শুধু জল খাব। এখানকার জল ছাড়া আমি খাই না জানো তো ?

প্রতাপের বাড়ির মেয়েদের কাছে হুড়ুর নবীন সন্ন্যাসীর গল্প শোনে নগেনের বাড়ির মেয়েরা।

ললিতা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, প্রথমটা ভড়কে গিয়েছিলাম সত্যি, একদৃষ্টে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন গিলে খাবেন ! এ কেমন সাধু, মেয়েবউ দেখে ধাত ছেড়ে যায় ? কেন ওভাবে দেখছিলেন, কথার ছলে বাবাকে বুঝিয়ে দিয়ে আমাকেই শেষে লজ্জা দিলেন। আমার মধ্যে নাকি অসাধারণ কিছু আছে, তাই বিশেষভাবে আমাকে লক্ষ করছিলেন। আমার ভেতরটা দেখছিলেন !

ললিতার মুখে বেদনার ছাপ পড়ে।

অনুতপ্ত প্রাণের বেদনার ছাপ। সখেদে বলে বাজে বদ লোকের চাউনি দেখে দেখে সত্যি আমাদের বিশ্রী ম্যানিয়া জন্মে যায়। খাঁটি যোগী সাধকের চাউনিটাও চিনতে পারি না। বাবার সঙ্গে ওনার কথাবার্তা শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার খেয়াল হল—আরে, কী বোকার মতো আবোল-তাবোল ভাবছি ! উনি তো গাঁজাখোর ভিখিরি সাধু নন। বড়োলোক বাপের এক ছেলে, কত বড়ো বিদ্বান, বিলাতে পড়তে গিয়েছিলেন, কত বছর ইউরোপ ঘুরে এসেছেন। হাই সোসাইটির কত শত শত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে উনি মিলেছেন মিশেছেন। সব ছেড়ে যোগসাধনা ধরেছেন, আমার মতো একজনের দিকে উনি তাকাবেন খারাপ চোখে !

সুদর্শনাও অন্য সকলের মতোই অভিভূত হয়ে শুনছিল, হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে সে বলে, বড়োলোকের এক ছেলের কিন্তু অনেক রকম পাগলামির রোগ জন্মায়। নানারকম উদ্ভট খেয়াল চাপে। দেশে-বিদেশে হইহুল্লোড় একঘেয়ে লাগল, ওভাবে আর রস মেলে না, তাই খেয়াল হল কিছুদিন যোগী সেজে মজা করা যাক।

সুদর্শনা একটু হাসে।—আমি অবশ্য দেখিনি তোমার যোগী পুরুষটিকে—খাঁটি না শখের যোগী জানি না। তবে এ রকম লোক স্বাদ বদলাতে যোগীও কিন্তু সাজে। বড়োলোকের সেকেলে মুখ্যু ছেলে বিগড়ে গেলে শেষ হয়ে যায়, একালের কিছুই জানে না, পাঁচজন একেলে বন্ধুর সঙ্গে একেলে উচ্ছৃঙ্খলতার মজাটা লুঠতে চায়। তলিয়ে যাবার উপক্রম ঘটলে আর কূলকিনারা পায় না—জানে না তো কীভাবে কোনটা ধরে ভরাডুবি সামলে নেবে। জগদীশবাবুরা একেলে ব্যাপার খানিকটা বোঝেন, সভ্য-জগতের সস্তা মজা লুটতে লুটতে কাবু হলে একেবারে ডিগবাজি খেয়ে সাধু বনে গিয়ে সামলে নিতে পারেন।

সুদর্শনার কথা সবাই শোনে। অনিচ্ছা নিয়েও বাধ্য হয়ে শোনে। তাদের সকলেরই অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী—কেন যে ছিটেফোঁটা বিদ্যার স্বাদ দেওয়া হয়েছিল। তাদের শুধু জব্দ করা সুদর্শনাদের কাজ।

একেবারে মুখ্যু করে রাখলে, সেকেলে করে রাখলে, তারা তবু অনায়াসে ঝংকার দিয়ে উঠে সুদর্শনাকে থামিয়ে দিতে পারত বক্তৃতা দিতে শুরু করামাত্র।

কী একটু বিদ্যা চাখিয়েছে, কী একটু স্বাদ দিয়েছে নতুন যুগের জীবনটায়—সুদর্শনা মাস্টারনির মতো উপদেশ আর বক্তৃতা ঝাড়তে শুরু করলে প্রাণটা এমন তড়বড় করে যে শেষ পর্যন্ত না শুনে পারা যায় না।

ললিতা খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো বলিনি, তুমি কী করে জানলে ওনার নাম জগদীশ ?

সুদর্শনা হাসে না।

গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করে, বমলাকে মনে আছে ললিতাদি ?

তোমাদের রাঁচির পাগলা গারদে দিদিকে দেখতে এসে তোমাদের বাড়িতে উঠত ? তোমাদের সঙ্গে কী যেন একটা সম্পর্ক আছে, ঠিক মনে নেই। দিদির কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলত—তোমাদের ওই যোগী সাধু জগদীশবাবুর জন্যই নাকি তার দিদির ওই অবস্থা হয়েছিল, রাঁচির পাগলা গারদে আসতে হয়েছিল।

ললিতা রেগে টং হয়ে বলে, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। বাবা ছ-মাস চেষ্টা করে একবার বাড়িতে আনতে পারলেন না, সংসারের ভোগে-সুখে ওঁর এমন বিতৃষ্ণা—উনি তোমার বন্ধুর দিদিকে পাগল করেছিলেন। আবোল-তাবোল কথা বললেই হল !

রমলার দিদি খুব সরল আর ইমোশন্যাল ছিল।

সে দোষ কি জগদীশবাবুর ?

কেন উনি সে বেচারাকে পাগল করে দিয়েছিলেন !

এ রকম তেজি বিদ্রোহী পুরুষের সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে গিয়েছিল কেন রমলার দিদি ? সামলাতে পারবে না, তবু লোভের বশে পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল কেন ? রমলার দিদি করবে বোকামি, শেষকালে নিজের দোষে পাগল হয়ে দায় পড়বে ওই মানুষটাব ঘাড়ে !

বাঃ, বেশ লজিক দিচ্ছ তো ! লাভে পড়ার ভান করে রমলার দিদিকে ঠকাল, সে বেচারা পাগল হয়ে গেল, ও বজ্জাতটার দোষ নয় তো কাব দোষ ?

বাজে বকিসনে মিছে। বাপের কাঁড়িকাঁড়ি টাকা, আবার এদিকে ভীষণ একেলে। যেমন টাকা, তেমনি স্মার্ট—আবার যেমন চেহারা তেমনি তেজ। রমলার দিদি জীবন পণ করেনি মানুষটাকে বাগাবার জন্য ? জীবনটা নয় নষ্টই হয়ে যাবে ভেবেই জেনে-বুঝে হিসেব করে মানুষটাকে বাগাতে এগোয়নি ? বোকার মতো জীবন পণ করে বাজি খেলেছে, হেরে গেছে। তারপর সে মরে গেছে না পাগল হয়েছে সে কথা আলাদা।

এমন নীরস নিষ্ঠুর উগ্র কী করে হল ললিতা ?

হুড্রু ফলস দেখতে গিয়ে জগদীশেব আশ্রম ঘুরে আসার পর কী যেন হয়েছে ললিতার।

গোড়ায় নয়।

জগদীশকে কিছুতেই বাড়িতে আনা যাচ্ছে না টের পাবার পর। নিজে বলেছিল আসবে। ছ-মাস চেষ্টা করেও তাকে আনা গেল না।

ললিতার সমস্ত হিসাবনিকাশ বিচারবিবেচনা ভণ্ডুল হয়ে গেল ! নিজেকে মনে হল বোকা আর বাঁকা। সস্তা আর বুদ্ধিহীনা। লাখটাকা উড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়ে, হতে চাইলে নিজেও দু-একবছরেই লাখপতি হতে পারে জেনে, জগদীশ যেন ওই জঙ্গলের ধারে কুঁড়েঘরে দিনরাত্রি কাটাচ্ছে প্রতাপকে বাগাবার জন্য ! যার বাপ রেখে গিয়েছে লাখটাকা, যে একটু আলগাভাবে চেষ্টা করলেই বাগাতে পারে লাখটাকা—সে চাইবে সাধু সেজে অরণ্যের প্রান্তে তপস্যা করার ধোঁকা দিয়ে তার শ্বশুরের ঘাড় ভেঙে কিছু টাকা বাগাতে !

নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে ললিতা।

ছিছি করেছে।

জগদীশের অতীত জীবন টেনে এনে কেউ তাকে ভণ্ড প্রতিপন্ন করতে চাইলে তাই ললিতার এত রাগ হয়।

প্রথম দিন আশ্রমে তাকে মা বলে ডেকে আর তার দিকে বিশেষভাবে তাকানোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে একবার জগদীশ তাকে লজ্জা দিয়েছিল। তাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে অস্বীকার করে আবার জগদীশ তাকে জব্দ করেছে—নিজের কাছে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে তার অন্তরের হীনতা আর দীনতা।

প্রতাপের সঙ্গে ইতিমধ্যে সেও কয়েকবার জগদীশকে দর্শন করতে গিয়েছিল। জগদীশের শ্রীমুখ থেকে নানালোকের নানা প্রশ্নের জবাবে উপদেশ ও ব্যাখ্যা শুনে এসেছে।

শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে রোমাঞ্চ হয়েছে ললিতার।

খাঁটি সাধক ছাড়া কি কেউ সব বিষয়ের সব কথা এমন স্বচ্ছ ও গভীরভাবে জানতে ও বুঝতে পারে, এমন সহজ সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতে পারে ?

ললিতা ঠিক করেছে—আর বোকামি করা নয়, পাকামি করা নয়। আর বিচার নয়, সন্দেহ করা নয়। এবার থেকে অন্ধ ভক্তি।

কে জানে, নিজের যে বিশ্রী মেয়েলি খুঁতটা আজও সে গোপন রাখতে পেরেছে, আলোককে টের পেতে দেয়নি যে মিলন তার কাছে প্রাণান্তকর অভিশাপের সমান, বিয়ের আগে যে খুঁতের কথা জানা থাকলে জীবনটা সে কুমারী থেকেই কাটিয়ে দিত—হয়তো জগদীশের দয়ায় সেরেও যেতে পারে সেই খুঁতটা !

তাই সুদর্শনা যে দিন থমথমে মুখ নিয়ে এসে প্রায় খোঁচা দিয়ে বলে যে, কপাল খুলেছে তোমাদের। রবিবার সকালে উনি পদার্পণ করবেন তোমাদের বাড়িতে—

ললিতা ভাবতেও পারে না সে জগদীশের কথা বলছে।

সরকারি একজন বৃহৎ ব্যক্তির পদার্পণ করার কথা ছিল তাদের বাড়িতে—মোটে দুদিনের জন্য ফ্লাইং ভিজিট।

ঘণ্টা খানেকের একটা কাজ আছে। গুরুতর ব্যাপার, পাহাড়ি উপজাতীয় মানুষদের সঙ্গে লড়াই করার মতো ব্যাপার। এমনি একটা বিশ্রী বীভৎস অন্যায় করা হয়েছে বুনো অসভ্য মানুষদের উপর যে তারা খেপে যেতে বাধ্য হয়েছে।

বন্দুক-কামানধারী সরকারের বিরুদ্ধে তারা তীর ধনুক খান্ডা ঝান্ডা বর্শা বল্লম নিয়ে রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে।

তুচ্ছ ব্যাপার ! তবু সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার দু-একঘণ্টার মধ্যে ব্যাপার বুঝে মিস্টার দাস সবদিক সামলে রাখার সহজ সরল উপায়টা বাতলিয়ে দিতে পারবেন বটে। তার পরামর্শে বুনো মানুষগুলোকে শান্ত এবং নত করা যাবে বটে—কিন্তু ?

সুদর্শনা মিস্টাব দাসের কথা বলছে ভেবে ললিতা বিরক্তির সঙ্গে বলে, মিস্টার দাস তো রবিবার বিকেলে আসবেন। তিনি আসছেন জরুরি কাজে। তোমার কাছে তার আসাটা এমন জরুরি ব্যাপার কেন হলো ভাই ?

মিস্টার দাসের কথা তো আমি বলছি না।

কার কথা বলছ ?

তোমাদের নতুন গুরুদেবের কথা বলছিলাম। আসবেন বলেও যিনি না এসে এসে, তোমাদের তুচ্ছ করে করে—

ও ! তাই বল। এমন করে তুই কথা বলিস, কী বলছিস বুঝতেই পারি না। মেয়েছেলের পেটে বেশি বিদ্যে হলে বুঝি এমনি কথার ছিরি হয় ?

মোটাসোটা সুদর্শনা রাগ করলেই তার টেবোটেবো ফরসা গালে যেন সিঁদুরে মেঘের ছোঁয়াচ লাগে, নীল শিরার লাল রংয়ের আর্টিস্টিক প্রকাশ ঘটে।

বেত বা চাবুক মারলে নীল শিরায় লাল রক্ত শুধু আঁকতে পারে কালচে দাগ,—সে রকম নয়।

গায়ে পড়ে খোঁচা দিয়ে অপমান করতেই সে এসেছিল, আক্রমণের কায়দা চোখের পলকেই যেন পালটে দেয় সুদর্শনা।

হঠাৎ সে হাতের তালুতে মাথা নামিয়ে মিনিট খানেক শব্দ করে নিশ্বাস নেয়। মাথা তুলে বলে, কী বিশ্রী বদ্ধঘর তোমার ললিতাদি ! এ ঘরে ছেড়ে দিলে কেষ্ট-রাধা প্রেম ভুলে যেত—ঘটে জিয়ানো মাছের মতো হাঁপ কাটত !

ললিতা টের পায় সুদর্শনার সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলেই ঝগড়া বাড়বে। সুদর্শনাকে কি বলা সম্ভব যে কিছুদিন আগেও বিলাত-ফেরত মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ ওই মানুষটার জন্য তার কিছুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না ?

সুদর্শনার বিয়ে হয়নি।

ওকে কি বোঝানো যাবে যে এ দেশে কুমারী মেয়ে যা ভাবে, বউ আর মা হতে শুরু করে তাকে ভুলে যেতে হয় আগেকার হিসাবনিকাশ ?

ক্রমে ক্রমে কত বড়ো অসম্ভবকে সম্ভব করার আশা জগদীশ তার মধ্যে জাগিয়েছে, কেন আর কীভাবে জাগিয়েছে, সে সব কথা কি বুঝবে কৃতী ছাত্রী কুমারী সুদর্শনা ?

ছ-মাস সাধ্য-সাধনার পর মহাসাধককে গৃহে পদার্পণ করাতে রাজি করানো গেছে।

জটা নেই। ফোঁটা চন্দন কাটে না। গেরুয়া বসন পরে না। ধুতি লুঙ্গি পায়জামা সব সমান রকম সই। গেঞ্জি বা শার্ট গায়ে চাপায়। গরম লাগলেই খালি গা !

বিরাট বিস্তৃত পাহাড়ি বন। তার ধারে আলপনার ছবির মতো গাঁ। তারই একটা সভ্যতা-বিবর্জিত কুঁড়েঘরে হাজার খানেক বাংলা ইংরেজি সংস্কৃত বই আর এককোণে আধহাত উঁচু থালা বাসন রাখার মাটির বেদিতে মাটির হাঁড়িকুঁড়ির সঙ্গে কয়েকটা কাচের গ্লাস এবং কয়েকটা দেশি-বিলাতি মদের বোতল।

কোথাও কোনো গোপনতা নেই !

শহুরে একজন শিক্ষিত শুদ্ধ সাত্ত্বিক পুরুষ করজোড়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, মদ খান কেন ?

তুমি খাওয়াও তাই খাই। এই জঙ্গলে এসে ধাওয়া করেছ তোমার জীবন-সমস্যার অঙ্ক আমায় কষে দিতে হবে। তুমি অভাব অশান্তির মাতাল, বিলাতি মদ না খেয়ে তোমার মতো নেশাখোরকে লাগসই কথা বলে ভোলাতে পারি না, তাই মদ খাই।

কৃতার্থ হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে গদগদ ভাষায় সে বলেছিল মদ খাওয়া আপনাকে মানায়। বিষপান নীলকণ্ঠেরই কাজ। মদ খাওয়া নিয়ে কত লুকোচুরি লোকের, মস্ত অপরাধ করছি। আপনি বোতল সাজিয়ে রেখেছেন, জিজ্ঞাসার অবকাশ না রেখে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছেন, ও সব আপনার চলে। মহাদেব যেমন কণ্ঠ বিষে নীল করে রেখেছেন সবাইকে জানাতে যে তিনি বিষ খান—বিষ আর অমৃত শুধু তাঁর কাছেই সমান।

মানুষটাকে মনে হয়েছিল পাগল। পরে জানা গিয়েছিল সে একজন নামকরা কবি ও সাহিত্যিক।

## চতুর্থ অধ্যায়

জগদীশ শহরে আসবে প্রতাপের বাড়িতে পদার্পণ করবে। শুধু প্রতাপের বাড়িতে নয়, আরও অনেকের বাড়িতে উৎসাহ-উত্তেজনা দেখা যায়।

পাহাড়ের উঁচু শহর।

দার্জিলিংয়ের সঙ্গে তুলনা হয় না। কিন্তু শীতের আমেজ শুরু হতে না হতেই যেন সকাল-সন্ধ্যায় শীত জোরালো হয়ে ওঠে। অকাল বর্ষা নামলে তো কথাই নেই। হাড়কাঁপানি ঠান্ডা পড়ে। সকালে জগদীশ আসবে। রাত্রে শুরু হল বৃষ্টি। যার জের চলল সকালেও।

সকলে হতাশ হয়ে ভাবল, এই আবহাওয়ায় জগদীশ কি আর আসবে ?

গাড়ি পাঠাতে জগদীশ নিষেধ করেছিল। তবু প্রতাপ ভোর রাত্রে গাড়ি পাঠিয়ে দেয়। মনিব নিজে ডাকতে এলেও মাইনে করা ড্রাইভার নন্দ বালিশ থেকে মাথা পর্যন্ত তোলে না, বলে, আজ্ঞে আমার জ্বর হয়েছে, গায়ে-হাতে ভীষণ ব্যথা।

ভাগিনী-জামাই আশ্রিত তরুণকে দিয়েই অগত্যা গাড়ি পাঠাতে হয়। তরুণকে গাড়ি চালাতে দিতে ভয় করে। স্পিডের দিকে ওর এমন বিশ্রী রকম ঝোঁক যে কবে কখন সর্বনাশ ঘটিয়ে বসে ভাবলেই হৃৎকম্প হয়।

ভোর রাত্রে পাহাড়ি উঁচুনিচু রাস্তায় সে কী স্পিডে গাড়ি চালিয়ে জগদীশের আশ্রম ঘুরে ফিরে আসে, অনায়াসে টের পাওয়া শুধু তার যাতায়াতের সময়ের হিসাব কষে।

যাই হোক, অক্ষত গাড়িটা নিয়ে জীবন্ত মানুষটা যে ফিরেছে তাই ঢের।

কিন্তু ব্যাপার কী ? খবর কী ?

আশ্রমে পৌঁছে তরুণ শুনতে পায় এই জল-বাদলার শীতের মধ্যে রাত তিনটেয় জগদীশ গোরুর গাড়িতে শহরে রওনা হয়েছে !

ফিরবার পথে তরুণ নাগাল ধরেছিল গোরুর গাড়িটার।

গাড়ি থামিয়ে জগদীশকে বলেছিল, এখনও তো আদ্দেক রাস্তা বাকি। আমার গাড়িতে নেমে আসুন, চটপট পৌঁছে যাবেন। ছইয়ের নীচে খড়ের বিছানায় আধ-শোয়া জগদীশ মাথা তুলেও তাকায়নি।

বেশ যাচ্ছি ঢকাস-ঢকাস করে। ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব।

সকলকে গরম জামা-চাদর বার করতে হয়েছে, গায়ে চাপাতে হয়েছে অকাল বর্ষার অস্বাভাবিক শীতে।

জগদীশ গোরুর গাড়ি থেকে নামে খালি গায়ে আলগা একটা পাতলা সুতির চাদর জড়িয়ে। গাড়ি চালিয়ে এনেছে জিরাই। তার গায়ে মোটা নিরেট চটের মতো বুনো সুতির চাদর।

সবাই ব্যাকুল হয়ে ভাবে যে এই কনকনে ঠান্ডায় জগদীশ উড়ানি গায়ে দিয়েছে, এটা কি বাহাদুরি দেখানো ?

সুদর্শনা সবার আগে মুখ খুলে প্রশ্ন করে, এর কোনো মানে হয় ? ঠান্ডা লেগে অসুখ করবে না ?

জগদীশ হাসিমুখে তাকে অভয় দিয়ে বলে, যার কোনো সুখ নেই, তার কখনও অসুখ হয় ?

সকলে ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে। হ্যাঁ, একটা গুজব তারা শুনেছে বটে।

রক্তজমাট করা খাঁটি শীতের রাত্রি। বনের রাত্রিচর হিংস্র পশু পর্যন্ত আশ্রয়ে মুখ গুঁজে আছে।

কম্বল গায়ে জড়িয়ে জগদীশ রওনা দিত হুড্রু জলপ্রপাতেব দিকে। বরফের মতো ঠান্ডা পাষাণে কুয়াশা-ঢাকা পূর্ণিমার চাঁদের ক্ষীণ আলোয় ভীতিকর রহস্যময় প্রপাতের দিকে চেয়ে বসে থাকত। একদৃষ্টে। ধ্যানীর মতো, যোগীর মতো, ঋষির মতো।

অন্য সকলে মেতে যায় জগদীশকে নিয়ে, সুদর্শনা জিরাইকে ডেকে নিয়ে যায় নিজেদের বাড়িতে। বুড়ো বুনো মানুষটাকে আদর করে বসায়, স্টোভ ধরিয়ে চা করে দেয়, খাবার খাওয়ায় !

বাড়ির সকলে প্রতাপদের বাড়ি গেছে জগদীশের বিলম্বিত পদার্পণকে সংবর্ধনা জানাতে।

নিশ্চিন্ত মনে সুদর্শনা প্রশ্ন করে, রাতদুপুবে সত্যি উনি জল-টোরপায় যান ? সারারাত বসে থাকেন ?

জল-টোরপা ! জিরাইয়ের হাসি পায়, বাগও হয়। তবু সে হাসে না, ক্ষমা করে। কে জানে কোথায় কার কাছে শুনেছে জলপ্রপাতের বুনো ভাষার নাম, কী শুনে কী বুঝে কীসে জড়িয়ে গিয়ে সুদর্শনার কাছে সে নামটা হযেছে জল-টোরপা !

বুড়ো জিরাই হাসিমুখে চা খায়, কথা কয় না। সুদর্শনা অনর্গল প্রশ্ন করে যায, জিরাই শুধু মাথা হেলিয়ে হেলিয়ে জানায় যে সব প্রশ্নই সে শুনছে।

তাবপর পৃথিবীর সেরা জ্ঞানীব মতো বলে, বাবার কথায় জল-টোরপা চলে। বাবা বললে নামে, বললে থামে।

সুদর্শনা টেব পায়, মনে মনে জিবাই হাসছে, মানুষের ভৌতিক শক্তিতে অন্ধ বিশ্বাসী বুনো বুড়ো খোকা সেজে তার সঙ্গে রসিকতা কবছে।

এমন আশ্চর্য হযে যায় সুদর্শনা যে রাগ করার কথা তার মনেও পড়ে না। জগদীশকে দেবতার মতো ভক্তি করে কিন্তু জিরাই জানে মানুষের মুখের হুকুমে জলপ্রপাত থামে না, চলেও না।

জগদীশের শিক্ষার ফল ?

অথবা-- ?

তার মুখ দেখে জিরাই এবার নিজে থেকেই তার কৌতূহল মেটায়, জগদীশের কথা বলে। গোডাব দিকে জগদীশ মাঝে মাঝে মাঝরাত্রে প্রপাতে যেত, পাথরে বসে সাধনা করত। শীত বর্ষা গ্রাহ্য করত না।

ফাঁকি নয়, বানানো গুজব নয়। শুধু জিরাই নয়, আরও পঞ্চাশ-ষাটজন সাক্ষী আছে—নিজের চোখে যারা জগদীশকে মাঝরাত্রে একা প্রপাতের দিকে যেতে দেখেছে, সাত রাত সেখানে বসে যোগসাধনা করতে দেখেছে।

স্টোভটা পাশেই জ্বলছিল। চা-খাবার করতে করতেই জিরাইকে পাশে বসিয়ে সুদর্শনা শুরু করেছিল তার জেরা কবার আলাপ।

কোথা থেকে ভৌতিক বাতাস আসে, পিছনে ঝুলানো শাড়ির আঁচলটা দোলা খেয়ে গিয়ে স্টোভের আগুনে জ্বলে ওঠে।

উবু হয়ে বসেছিল জিরাই, সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুতে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে এগিয়ে কড়া হাতের তালুর চাপড়েই ধরা আঁচলটা নিভিয়ে দেয়।

সুদর্শনা যেন স্বপ্ন থেকে জাগে।

হাতে ছ্যাঁকা লাগেনি তো তোমার ? মলম লাগিয়ে দেব ? জিরাই শুধু মাথা নাড়ে।

সুদর্শনা ভেবেছিল, পনেরো-বিশমিনিটের বেশি লাগবে না জিরাইকে কাছেই নিজেদের খালি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করতে।

এরা এখনও মিথ্যা বলতে শেখেনি, আদিম সত্যের কবলেই এখনও এরা পড়ে আছে। সরলভাবে দরদ দেখিয়ে ডেকে আদর করে ভালোমন্দ খেতে দিলে বুনো মানুষটার মুখ খুলে যাবে।

জানা যাবে মাঘের রাতেও জগদীশের প্রপাতে গিয়ে সারারাত সাধনা করার গুজবটার সত্য-মিথ্যা।

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে সুদর্শনা টের পায়, দেড় ঘণ্টা কেটে গেছে জিরাইকে জেরা করতে !

মাথাটা ঘুরছিল। অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল। কিছুই সে বুঝতে পারল না বুনো অসভ্য মানুষটাকে দেড় ঘণ্টা জেরা করে।

জিরাইকে সে বিদায় দেয়।

ছেলে এবার তুমি ফিরে যাও। পথ চিনে যেতে পারবে ?

ছেলে ? ছেলে বানালি ?—আনন্দের হাসিতে যেন ফেটে পড়ে জিরাই !

জিরাই চলে গেলে খালি বাড়িতে নিজের ঘরে একলা বসে সুদর্শনা ভাবে, কী বুঝতে চেয়ে সে কী বুঝল ? দেহমনটাই বিগড়ে গেল নিজের।

ঝোঁকের মাথায় নয়। আত্মহত্যার নেশায় নয়। জগদীশ তবে সত্যই হুড্রুতে মাঝরাত্রে যেত যোগসাধনা করতে ?

সেই মারাত্মক সাধনা তাকে এমন মহাপুরুষত্ব দিয়েছে যে প্রতাপবাবুরা তাকে একটিবার বাড়িতে আনার জন্য ছ-মাস ধরে সপরিবারে সাধনা করে ?

তার বাড়ির ছেলেবুড়ো মেয়ে-পুরুষ সকলে যোগ দেয় সেই সাধনায় ?

সারাদিন কাটে রাঁচি শহরে।

কলকাতা লন্ডন থেকে পৃথিবীর এ শহর ও শহর চষে এসে রাঁচি শহরের গা-ঘেঁষা খাঁটি আদিম অরণ্যের মধ্যে অসভ্য আদিবাসীদের সঙ্গে বাকি জীবনটা সংক্ষেপে শেষ করে দিতে দেশি বিলাতি জংলি নেশাটা বেপরোয়া হয়ে চালাতে গিয়েই জগদীশ টের পেয়েছিল এভাবে মরা তার আত্মহত্যা করার চেয়ে সহজ হবে না।

চিত্রার মানের জন্য তার মৃত্যু শুধু কষ্টকর হবে না- -অর্থহীন হবে।

বহুদিন পরে শহরের সভ্য মানুষদের মধ্যে দিনটা কাটাতে কাটাতে বারবার জগদীশের মনে প্রশ্ন জাগে : এইখানেই কি জের মিটবে ? অথবা এমনিভাবে হাত বাড়িয়ে জীবন তাকে আবার টেনে আনবে শহরে ?

## পঞ্চম অধ্যায়

দিন দিন আরও বিচিত্র হয়ে ওঠে দর্শনার্থীদের সমাবেশ। ছাত্ররা পর্যন্ত আসতে শুরু করে।

সকলকে সামলায়। সকলের প্রাণকে নাড়া দেওয়ার মতো কথা বলে। দেশ-বিদেশের মানুষ আর দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো কথাই যেন তার অজানা নেই।

নগেন ও প্রতাপেরা মিলেমিশে সপরিবারে যেদিন গিয়েছিল তার আশ্রমে সেদিন সে ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিল কুড়ি-বাইশজন কলেজের ছাত্রকে।

তারাও পৌঁছেছিল কিছুক্ষণ আগেই। সবেমাত্র প্রশ্ন করা শুরু হয়েছিল।

কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে জগদীশ হঠাৎ কড়াসুরে বলে, তোমরা কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে এসেছ, না, সত্যি তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?

একটি ছেলে বলে, আমরা সিরিয়াসলি জানতে বুঝতে এসেছি সার ! মুখ দেখেই টের পাওয়া যায় ছেলেটি খুব চালাক-চতুর এবং ভাবুক প্রকৃতির।

এই বুঝি তোমাদের সারের কাছে সিরিয়াসলি জানতে বুঝতে আসার নমুনা ! কী জানতে বুঝতে চাও তাই তোমাদের ঠিক নেই। যার যেমন খুশি এলোমেলো প্রশ্ন করে যাবে আর আমি আবোল-তাবোল বকব ? নিজেরা পরামর্শ করে ঠিক করে আসতে পারোনি কী তোমাদের জিজ্ঞাসা ?

আরেকটি ছেলে বলে : আমাদের অনেক রকম জিজ্ঞাসা কিনা—

এ ছেলেটিও কম সিরিয়াস নয়। তার ব্যাকুল উৎসুক ভাব থেকেই তা টের পাওয়া যায়।

মাস্টারমশাইদের জিজ্ঞাসা কোরো। আমি এলোমেলো প্রশ্নের জবাব দেব না।

চালাক-চতুর ভাবুক ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমাদের ভুল হয়ে গেছে সার। একটু সময় দিন, আমরা প্রশ্নগুলি ছকে ফেলছি।

জগদীশের দিকে পিছন ফিরে তারা গোল হয়ে বসে এবং গুঞ্জরিত মুখরিত হয়ে ওঠে। মনে হয় না জগদীশকে কী প্রশ্ন করা হবে এ বিষয়ে কোনোদিন তারা একমত হতে পারবে !

কয়েক মিনিট পরেই কিন্তু তাদের মুখরতা থেমে যায়। দেখা যায় চালাক-চতুর ভাবুক ছেলেটি আলোচনা চালাবার নেতৃত্ব নিয়েছে। মিনিট পাঁচেক ধরে সে ছোটোখাটো একটা বক্তৃতা দেয়—তারপর অভিজ্ঞ ও দক্ষ নেতার মতো বৈঠকের আলোচনা পরিচালিত করে কাগজে-কলমে সর্বসম্মতিক্রমে প্রশ্ন ছকে জগদীশের দিকে ঘুরে বসে।

বলে, আমাদের প্রধান জিজ্ঞাসা তিনটি। ধর্ম কী ? ভগবান কী ? বিজ্ঞান সত্য না ধর্ম সত্য ? আপনার জবাব শোনার পর হয়তো আমরা আরও দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব।

জগদীশ একটু হেসে বলে, এটা কি তোমাদের ডিবেটিং ক্লাবের মিটিং ? আমি যেটুকু জানি যেটুকু বুঝি বলব—তর্ক করতে পারব না।

আমরা কি তর্ক করতে এসেছি সার ? আপনার কথা শুনতে এসেছি। আপনার কথা কীভাবে নেব, কতটা মানব কতটা মানব না সেটা আমরা ঠিক করব, আপনাকে ভাবতে হবে না।

তোমার কী নাম ?

বরেন দত্ত। আমি গুণময় দত্তের ছেলে।

ফিলজফার গুণময়বাবুর ছেলে ? বেশ, বেশ। কী পড়ছ ?

বি এসসি। ফোর্থ ইয়ার।

প্রতাপ ও নগেনের পরিবার এবং সমবেত অন্যান্য ভক্তেরা নীরবে কলেজি ছাত্রদলটির সঙ্গে জগদীশের আলাপ-আলোচনা শোনে।

তাদের যেন কোনো প্রশ্ন নেই, তারা যেন কোনো আশা নিয়ে আসেনি।

জগদীশ হাসিমুখেই বলে, তোমাদের তিনটে প্রশ্নই অর্থহীন। কেন অর্থহীন জানো ? এ সব প্রশ্নের জবাব তোমাদের কোনো কাজে লাগবে না। এটাই কি ছাত্রদের আসল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—ধর্ম, ভগবান আর বিজ্ঞানের মিল কতটা ?

জগদীশ মাথা নাড়ে।—ওই প্রশ্নগুলি তো তোমাদের প্রাণের প্রশ্ন নয়, আসল প্রশ্ন নয় !

ছাত্রেরা চুপ করে থাকে। অন্য সকলেও চুপ করে থাকে।

জগদীশকে তারাও খানিকটা জেনে-বুঝে গিয়েছে বইকী। তার প্রশ্নের জবাব দেবার স্টাইল খানিকটা ধরতে পেরেছে বইকী।

তিনটি প্রশ্নের নিগূঢ় প্রশ্নের জবাবে জগদীশ কী বলে শুনবার জন্য সকলেই কান খাড়া করে ছিল। সকলেই কমবেশি হতাশাবোধ করে। জগদীশ কি এড়িয়ে গেল প্রশ্নগুলি ?

এমন তো সে কোনোদিন করে না !

জগদীশের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটতে দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়।

কাজেই আমাকে এ সব প্রশ্ন করা তোমাদের চ্যাংড়ামি ছাড়া আর কিছু নয়। কোনোদিন ভাবো না ধর্ম কী—ভাববার দরকার হয় না। ও তো জানাই আছে, ধর্ম মানে কুসংস্কার। ভগবান কী তাও জানাই আছে—তিনি হলেন আঁধার ঘরের বোকা মানুষদের ভোলাবার জন্য আলোর ঘরের মানুষদের কল্পনা—বিরাট একটা ধাপ্পা। বিজ্ঞান তো ডালভাত। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে পড়তে শুনতে দেখতে আকাশে উড়তে, হাতের কাছের সূক্ষ্ম অদৃশ্য জিনিস আর কোটি মাইল দূরের সূর্যের চেয়ে হাজারগুণ বড়ো অদৃশ্য পদার্থ দেখতে—

জগদীশ আবার সকৌতুকে হাসে।

সকলে কৃতার্থ হয়ে নড়েচড়ে বসে। না, এড়িয়ে যাবে কেন। প্রশ্নগুলি কী ধাঁচের বিবেচনা করতে হবে তো ! জগদীশ ভূমিকা করছে।

ধর্ম দিয়ে যা হয়নি, ভগবান দিয়ে যা হয়নি—বিজ্ঞান তাই করেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা করেছে, কীসে কী হয়, কেন হয় মানে বুঝিয়ে দিয়েছে—আবার কাজে করে দেখিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞান শুধু কথা নয়, হাতেনাতে বিজ্ঞান নিজেকে প্রমাণ করে করে এগোয়। বিজ্ঞান শুধু জ্ঞান নয়- -বিজ্ঞান।

বরেন মুখ খুলতে যেতেই সে হাত বাড়িয়ে তাকে চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত জানিয়ে বলে, বিজ্ঞানের মূল কথাটা মুখস্থ করে জেনেছ, ভেবেছ বৈজ্ঞানিক বনে গিয়েছি। ধর্ম কী, ভগবান কী, না ভাবলেও চলবে। বিজ্ঞানে বাতিল হয়ে গেছে ধর্ম আর ভগবান।

বরেন আবার মুখ খুলবার উপক্রম করতেই সুদর্শনা রেগে গিয়ে প্রায় ধমকের সুরে বলে, চুপ করে থাকুন না পাঁচ মিনিট ? উনি কী বলছেন আগে শুনুন না ? তারপরেই নয় চ্যাংড়ামি করবেন !

জগদীশ খুশি হয়ে বলে, রেগে উঠে না বুঝে ঝোঁকের মাথায় ধমক দিয়ে বলেছ, কিন্তু বলেছ ঠিক কথাই। বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানের ছাত্রের এ রকম অধৈর্য অস্থিরতা হাতেনাতে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের মতো দেখিয়ে দেয় জগতে আজ ধর্মান্ধতার পাশাপাশি বিজ্ঞানান্ধতাও আছে। তাই তো কষ্ট হল মনে, তাই তো বিদ্বান বুদ্ধিমান নওজোয়ানদের বলতে হল তোমরা আমায় চ্যাংড়ার মতো প্রশ্ন করেছ।

এবার জগদীশ প্রশান্তভাবে হাসে।

বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে জানে না বিজ্ঞানের আসল ভূমিকা কী—এটা কত বড়ো আপশোশের কথা তোমরাই বলো তো ? ধর্মবিশ্বাসকে উৎখাত করা ভগবানকে বাতিল করা—এই কি বিজ্ঞানের কাজ,

বিজ্ঞানের আসল কথা ? বিজ্ঞান কি হিন্দু-মুসলিম ক্রিশ্চান ইত্যাদি ধর্মের বিরুদ্ধে গজানো নতুন আরেকটা ওই জাতের ধর্ম ? বিজ্ঞান জানে মানুষের প্রয়োজনেই ধর্ম, মানুষের প্রয়োজনেই ভগবান—প্রয়োজনটা বাতিল না করে ধর্মবিশ্বাস বা ভগবানকে দুটো যুক্তি দিয়ে আক্রমণ করে বাতিল করার ছেলেমানুষি কি বিজ্ঞানের পোষায় না মানায় ? ও সব মানুষের প্রয়োজন কেন তাই নিয়ে বিজ্ঞান মাথা ঘামায়,—কোনো অবস্থায় কেন মানুষের ভগবান দরকার হয়, কোন অবস্থায় কীভাবে মানুষ নিজেই ভগবান হতে পারে জানবার বুঝবার চেষ্টা করে। ধর্মের সঙ্গে সোজাসুজি কোনো বিরোধ নেই বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান কখনও কোনো ধর্মকে গাল দেয়নি, কখনও দেবেও না। ভগবান আছেন কী নেই, বিজ্ঞান তা নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামায়নি, কোনোদিন ঘামাবেও না।

অনেকবার দমিয়ে দেওয়া হয়েছিল বরেনকে, মুখ খুলতে গিয়েও কথা বলতে পারেনি। এবার সে যেন ফেটে পড়ে। চিৎকার করে বলে, বিজ্ঞান ধর্মকে মানে ?

তার এই ঔদ্ধত্যে সমাবেশ গুঞ্জরিত হয়ে ওঠামাত্র হাসিমুখে দু-হাত প্রসারিত করে সকলকে জগদীশ চুপ করিয়ে দেয়।

তোমরা সবাই অস্থির হয়ো না। তোমরা আমায় শিক্ষা দিলে বটে—নতুন শিক্ষা দিলে। বাবার শ্রাদ্ধ করার সময় ঘরের লোকদের সঙ্গে আমার একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের বংশের নিয়ম বাপের শ্রাদ্ধে অন্নসত্র খুলতে হবে--যে আসবে তাকেই তিন দিন ভরপেট অন্ন দিতে হবে। সকলে বারণ করেছিল। ভীষণ দুর্ভিক্ষের কাল, কয়েক শো ভিখারিই তো শুধু আসবে না। দারুণ আকালে তারাও আসবে যারা মরে গেলেও ভিক্ষে করতে বার হবে না কিন্তু বাপের শ্রাদ্ধে কেউ সার্বজনীন নেমন্তন্ন জানিয়েছে শুনলেই সপরিবারে এসে হাজির হবে। আমি কারও কথা শুনিনি, জিদ করে অন্নসত্র খুলেছিলাম। তিন দিনের ধাক্কা সামলাতে সব চেয়ে বড়ো খাস তালুকটা বেচে দিতে হয়েছিল। উপোস করে যারা মরছে তাদের খাওয়ানোর জন্য নয়—নিজের জিদ বজায় রাখার জন্য। যা খুশি করার জিদ বজায় রাখার জন্য তার আগে তিনটে তালুক বাঁধা দিয়েছিলাম, লাখ টাকার মতো ঋণ করেছিলাম। তাতে আমার আপশোশ হয়নি। বাপের শ্রাদ্ধের নিয়ম মানার জিদ রাখতে, তিন দিন যে আসবে তাকেই খাওয়ানোর জিদ রাখতে তালুকটা দিতে হয়েছিল বলে মাথার চুল ছিঁড়েছিলাম।

গুম খেয়ে গেছে আসর। জগদীশ টের পায় সবার মনের মোট কথাটা। প্রসঙ্গ পালটে গেল ? ছেলেরা পুরো জবাব পেল না ? নিজের কথা বলতে শুরু করল জগদীশ।

আবার জগদীশ হাসে।

ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি ভাবলে তো সবাই ?

তার হাসি আর প্রশ্নের কায়দায় এক মুহূর্তে মনের মোড় ঘুরে যায় সকলের আবোল-তাবোল কথা কী বলতে পারে জগদীশ—নিজের কথা বলা কি তার পেশা !

কী কথায় কী কথা কেন টেনে এনেছে নিজেই সে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবে নিশ্চয়।

এই জিদের চেহারা হল দুরকম। একটা চেহারা—ফাঁকা অহংকার। লোকে কী বলবে, লোকে কী ভাববে মনে করে কেঁউকেঁউ করছে মনটা—সেটাই প্রকাশ পাচ্ছে লোকের কাছে বাহাদুরি করার চেষ্টায়। তালুক বেচে মাথার চুল ছিঁড়ব, চিরদুর্ভিক্ষের দেশে তবু চালিয়ে যাব তিন দিনের অন্নসত্র। জিদটার আরেক চেহারা হল জ্ঞানের অহংকার। আমি যেটুকু জেনেছি সেটুকুই চরম জ্ঞান। আমরা সবাই জানি অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী, কিন্তু কেন ভয়ংকরী তা জানি না। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান বাড়িয়ে চলার সাধনায় চিরদিন সব চেয়ে বড়ো বাধা হয়ে থেকেছে আমিত্বের অহংকার। আমি যেটুকু জানি সেটা জানাই যথেষ্ট—এই অহংকার। সকলের দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থেকে জগদীশ আমোদের হাসিতে শব্দিত হয়ে ওঠে।

ভাবছ তো আমি মানুষের নিন্দা করছি ? দোষ দেখাচ্ছি ? না-বিদ্যা অল্পবিদ্যাওলাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব চেয়ে বড়ো শত্রু বলছি ? বরেনকে বুঝিয়ে দিচ্ছি ওদের অল্পবিদ্যার চ্যাংড়ামিই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব চেয়ে বড়ো বিপদ ? তোমরা ভুল কথা ভাবছ—আমি যা বলতে চাই তার উলটো কথা ভাবছ !

কেউ কথা বলে না।

মানুষের ধর্ম ভগবান জ্ঞান-বিজ্ঞানে সভ্যতা কীসের ওপর দাঁড়িয়েছিল, এখনও দাঁড়িয়ে আছে ? সত্যের ভিত্তি ছাড়া দাঁড়াবার কোনো অবলম্বন ছিল না মানুষের, আজও নেই। সত্যকে ধরেই মানুষ এতদূর এগিয়েছে, আরও এগোবে। তোমার আমার মুশকিলটা কী জানো ? সত্য কী তার নানারকম ব্যাখ্যা শুনি, নিজেরাও নানারকম মনগড়া ভাবার্থ করে নিই। তবে এ বিভ্রান্তি কেটে যাচ্ছে। সত্য কী তাই নিয়ে যে নানারকম ধারণা, এ যুগে আমরা এটাকেও সত্য বলে জানতে পেরেছি, মানতেও পেরেছি। সকলে নয়—কিছু লোকে পেরেছি। সত্য সম্পর্কে ধর্ম আর বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎটা এবার ধরবার চেষ্টা করো। বিজ্ঞান বলে আমরা যতটা জেনেছি ততটাই সত্য,– অনেক সত্য আমরা জানি না। নতুন সত্য জানার পর হয়তো এখন যেটা সত্য বলে জানি সেটা মিথ্যা হয়ে যাবে কিন্তু যতদিন বিজ্ঞানের বিচারে এটা সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে থাকবে ততদিন এটাই আমাদের কাছে সত্য।

বরেন প্রশ্ন করে, কিন্তু কতগুলি মূলনীতিকে বিজ্ঞান কি চিরদিনের জন্য অভ্রান্ত বলে না ? নতুন আবিষ্কারের ফলে আজকের একটা থিয়োরির বদলে নতুন থিয়োরি হতে পারে—এটা বিজ্ঞান মানে। কিন্তু বিজ্ঞান কী বলে না, চিরকাল দুভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন মিলে জল হবে, অন্য কিছু হবে না?

না। বিজ্ঞান অমন একগুঁয়ে নয়।

বরেন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

জগদীশ বলে, চিরদিন সীমাহীন অনন্ত এ সব কথার মানেটাই বিজ্ঞানে গ্রাহ্য—সীমাহীনকে মগজে একটা ধারণার রূপ দেবার চেষ্টা বিজ্ঞান করে না। পদার্থের রূপান্তর বিজ্ঞানের একটা সত্য। কাজেই বিজ্ঞান কী করে চিরদিনের কথা বলবে ? একদিন হয়তো হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন বলে কিছু পৃথিবীতেই থাকবে না, অন্য কিছু হয়ে দাঁড়াবে। বিজ্ঞান তাই বলে, এখনকার অবস্থা যতদিন থাকবে দু-ভাগ এই হাইড্রোজেন আর এই অক্সিজেন মিলে জলই হবে, অন্যকিছু হবে না।

সুদর্শনা বলে, এবার ধর্মের সত্য আর বিজ্ঞানের সত্যের তফাতের কথা বলুন।

জগদীশের মুখে হাসি দেখা দেয়।—সত্য আবার ধর্মের বা বিজ্ঞানের হয় নাকি ? সত্যকে একভাবে জানা আর মানা হল ধর্ম, অন্যভাবে জানা আর মানা হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কীভাবে সত্যকে নেয় বলেছি—নতুন সত্য অথবা সত্যের নতুন রূপ আবিষ্কৃত হতে পারে এটা বিজ্ঞান মানে কিন্তু অনাবিষ্কৃত অপ্রমাণিত সত্য বিজ্ঞানের কাছে সত্য নয়। ধর্ম বলে, আমি সমগ্র সত্য জানি, চিরন্তন সত্য জানি। ভগবান বা ভগবানের মতো কোনো সত্যকে মূল ধরে নিয়ে ধর্ম বাস্তব জগতের সত্যকে বিচার আর ব্যাখ্যা করে। সমস্ত ধর্মেই যে অন্য সবকিছুর সঙ্গে মানুষের সামাজিকভাবে বাঁচার নিয়মনীতির বিধান রাখতে হয়, এটা কখনও খেয়াল করেছ বরেন ?

বরেন মৃদু ও কাতরস্বরে বলে, আপনার বুঝিয়ে দেবার প্রসেসটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি বলে—

আমি তো রাগ করিনি ভাই।

ভাই !

প্রতাপেরা যাকে বাবা বলে ডাকে, কলেজের একটা চ্যাংড়া ছোঁড়াকে সে বলছে ভাই !

জগদীশ গম্ভীর মুখে শান্তকণ্ঠে বলে যায়, তোমার কথাব জবাব দিতেই এত কথা বলেছি। একটা মানুষের নিজের চেতনাতেই কত বিরোধ, একই ভাবেব কত বিপরীত ভূমিকা। তোমার আমার চিন্তায় কত অমিল আছে ভাবো তো ? বিজ্ঞান ধর্মকে মানে বলছি ভেবেই তুমি গেলে চটে ! কেন চটলে শুনবে ? মানা কথাটা মানে তুমি বুঝছ এক রকম, আমি বুঝি অন্য রকম। আমি কোন অর্থে বলেছি বিজ্ঞান ধর্মবিশ্বাস মানে, ভগবান মানে ? যে অর্থে বলা যায় বিজ্ঞান কুসংস্কার মানে, পাপকেও মানে ! ধর্মবিশ্বাস আছে, বিপাকে পড়ে মানুষ ভগবানকে ডাকছে—এই বাস্তব সত্যটাকে বিজ্ঞান উড়িয়ে দেবে কেন ?

বরেনের মুখে হাসি ফোটে।

এবার বুঝেছি !

কুঁড়েতে ফিরতে সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু নেশা শুরু করার জন্য আজ যেন তেমন ব্যাকুলতা নেই।

ধীরে সুস্থে সে নেশা শুরু করে। তাপ্পি এটা-ওটা জোগান দিয়ে যায়, তাকে জিজ্ঞাসা করে রাত্রের খাবার তৈরি করে।

রাত্রে জগদীশ খাবে কি খাবে না কিছুই ঠিক নেই—অধিকাংশ রাত্রেই সে কিছু খায় না।

তাপ্পির পরিপুষ্ট সুগঠিত দেহটার দিকে চেয়ে আজ একটি প্রশ্ন জাগে জগদীশের মনে : নারীদেহের কামনা যে তার একেবারে শেষ হয়ে গেছে, কোনো নারীদেহ স্পর্শ করার কথা কল্পনা করলেও গভীর বিতৃষ্ণায় সর্বাঙ্গ যে তাব কুঁকড়ে যেতে চায়, চিত্রার জন্য মনোবেদনাই কি তার একমাত্র কারণ ? এই যে কড়া বিষ সে পান করে চলেছে দিনের পর দিন, খাদ্যের জন্য খিদে পর্যন্ত যা নিস্তেজ করে দেয়—তার কি কোনো প্রভাব নেই তার কামনা ঝিমিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ?

টের পাওযা যায় তাপ্পি আজ একটু অস্বস্তিবোধ করছে।

ঠিক বটে, বাত হযে গেছে।

সকাল থেকে তাপ্পি তাব সেবা করে সন্ধ্যাব পব পর্যন্ত—ততক্ষণে নেশা চড়ে যায়। তাপ্পিকে সে হুকুম দেয়, এবাব যা, ভাগ।

তাপ্পি চলে যেতে একটু দেরি করলে গর্জন করে ওঠে।

আজ রাত হয়ে গেছে বলেই কি তাপ্পি অস্বস্তিবোধ করছে !

তার ভয়ে ?

অথবা তার মরদের ভয়ে ?

তাপ্পির মরদ কিরপা অন্যের পরামর্শে শহরের মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করতে চলে গিয়েছিল। তাপ্পিকেও সঙ্গে নিতে চেযেছিল, তাপ্পি যায়নি।

নোংরা বীভৎস কাজ, কঠিন খাটুনি। কিন্তু জীবন সেখানে বড়ো মক্কাদার। ধাঙড় মহল্লায় সবাই মিলে নেশা করা, মাঝে মাঝে পোষা শুয়োর পুড়িয়ে হইহুল্লোড় করা—এ সব মজা কি আর ময়লা ঘাঁটার খাটুনি না খেটে মেলে !

স্বভাব বিগড়ে গেছে কিরপার। উপজাতীয় মরদের জীবনযাত্রার রীতিনীতি মেনে চলা তার পোষায় না।

তারা মেয়ে-পুরুষ খেটে খায়, খুশি হলে মরদ মেয়েমানুষকে মারধোর করবে আর সে নিরুপায়ের মতো তা সয়ে যাবে, এ অনিয়মের ধার তারা ধারে না।

শহর থেকে কিরপা নেশার ঝোঁকে তাপ্পিকে গালাগালি করার, চড়চাপড় মারার স্বভাব নিয়ে এসেছে।

জগদীশের কাজ আর সেবা করে তাপ্পি যা পায় তাতেই চলে যায়—কিরপা টের পেয়ে কিছুদিন থেকে শহরে ধাঙড়ের কাজে খাটা বন্ধ করছে। এখানে এসে নিষ্কর্মা হয়ে বসে আছে।

ধাঙড় মহল্লায় উৎসব হবে খবর পেলে তাপ্পির কাছে পয়সা চেয়ে নিয়ে হইচই করে আসতে যায়।

তাপ্পির মুখে এ সব শুনেছিল জগদীশ, জিজ্ঞাসা করেছিল, তাড়িয়ে দিস না কেন ?

কতবার তাড়িয়ে দিয়েছে, কতবার বাপের সঙ্গে ঠিক করে ফেলেছে সামাজিকভাবে বিয়েটা বাতিল করে নেবে—কিন্তু কিরপাকে নিয়ে হয়েছে ফ্যাসাদ।

নেশা কেটে গেলে সে তাপ্পির পা জড়িয়ে ধরে, ক্ষমা না করা পর্যন্ত ছাড়ে না।

তোকে খুব ভালোবাসে, না ?

ভালোবাসার মানে তাপ্পি জানে না, সে নীরবে জগদীশের মুখের দিকে চেয়েছিল।

জগদীশের মনে পড়ে কালও বাড়াবাড়ি করায় কিরপাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিরপা চলে গেছে তাপ্পি ?

নঃ ! উ যাবেক নাই !

খাবে কী ?

উ জানে !

কিরপাকে বলেছিলি তুই আমার মেয়ে, তুই আমার মা ?

তাপ্পি মুখ বাঁকায়।

তুমার ব্যাটা শহরে ময়লা ঘাঁটে। বদ বনে গেছে।

ঘরের খোলা ঝাঁপটার আড়ালেই বুঝি ছিল কিরপা।

ভিতরে ঢুকে বলে, খুন কবব।

জগদীশ বলে, কব। খুন কর। কাকে খুন করবি ? মোকে না মোর ওই মা-কে ?

খুন করার কোনো আদিম অস্ত্রও কিরপা আনেনি, খালি হাতে খালি গায়ে বুখে এসেছে।

মা ? ও তুমার মা ?

সব মেয়ে আমার মা। এই বেটি হল আমার ঘরের মা।

আমাকে ভাত খাওয়ায়, মদ খাওয়ায়, সামলে চলে।

কিরপার বেশভূষায় অনেক দিন শহরে ধাঙড়গিরি করার ছাপ নেই—পরনে তার বুনো তাঁতে বোনা তুলোর সুতোর চটের মতো মোটা দেড় হাত কাপড়।

শুধু চেহারায় ছাপ পড়েছে শহরের, শুধু মুখের ভাবে।

একলা ঘরে জগদীশ ভাবে, আজ এত ভালো কেন তার মেজাজ ? কই, সারাদিন তো চটেনি দু-একবারের বেশি ! কিরপাকে পর্যন্ত একটা ধমক দিল না !

## ষষ্ঠ অধ্যায়

উদ্‌ভ্রান্ত জীবন কি এনে দিয়েছে উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তা আর অনুভূতি ? মাঝে মাঝে জগদীশের এমন উদ্ভট মনে হয় নিজেকে এবং জীবন ও জগৎকে !

বড়ো বড়ো কথা আজও সে ভাবে, সূক্ষ্ম চিন্তা করতে পারে—সব সময় না হলেও। বড়ো কথা, সূক্ষ্ম কথা বলে জ্ঞানী অভিজ্ঞ বিষয়ী এবং বয়স্ক ভদ্রলোকদের ভক্তে পরিণত করতে পারে।

জগদীশ জানে ধন-মান রূপযৌবন শিক্ষাদীক্ষা অনেক কিছু বাতিল করে বনবাসী হয়েছে বলেই শুধু নয়—এ সব ওদের শুধু টেনে আনে তার কাছে।

কিন্তু তেজ আর কথার জোরেই সে ওদের স্থায়ীভাবে বশ করেছে। নইলে বনবাসী সাধু বলে দর্শন করতে এসে প্রণামি দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করেই ওরা যথেষ্ট হয়েছে ভেবে বিদায় নিত—দু-একজন ছাড়া আর আসত না।

কিন্তু মানে কী সব কিছুর ?

তার প্রেমের মানে ? জীবনের মানে ? বুনো মানুষগুলির বাঁচার মানে ? শহরের মানুষগুলির জীবনের মানে ? বনে আত্মহত্যা করতে এসে ধীরে ধীরে তার সাধু হয়ে ওঠার মানে ?

অতল গভীর এক নতুন হতাশা ঘনিয়ে আসে—যা ভাবাবেশের হঠকারিতায় চিত্রাকে জলপ্রপাতে বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে যেন ভয়ানক !

আরও কড়া ব্যথায় যেন ঢের বেশি টনটন করে হৃদয়-মন ! নেশার ঘুম কিছুতেই আর রাতভোর টানা চলছিল না। ভোর হবার অনেক আগে, ব্রাহ্ম মুহূর্তের অনেক আগে ঘুম ভেঙে যায়।

একবারমাত্র সে চেষ্টা করেছিল আবার নেশা চড়িয়ে ভাঙা ঘুম জোড়া দিয়ে আবার একটু ঘুমিয়ে ব্যথার বাতটা পোহাতে। পরদিন প্রায় বিকাল পর্যন্ত দেহমনের অকথ্য বীভৎস যন্ত্রণা তাকে নিজের শরীরের রক্তবাহী শিরা চিবে দেবার অথবা আমগাছের ডালে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়বার জন্য উতলা করে তুলেছিল।

সেই থেকে এমন আতঙ্ক জন্মে গিয়েছে যে রাত দুটোয় নেশার ঘুম ভেঙে গেলেও সে আর ঘুমোবার কৃত্রিম চেষ্টার ধার ঘেঁষে না। ভাবে আর বই পড়ে।

সে রাত্রে কুঁড়েতে বই ছিল মাত্র একখানা--তরুণের লেখা প্রথম কবিতার বই 'ভারতের প্রেতাত্মা।'

নিজেই পয়সা খরচ করে ছাপিয়েছে, বোধ হয় পাসের জোরে বিয়ে করে পাওয়া পয়সায়। সকলে নিন্দা করলেও বইটা খুব বিক্রি হয়েছে—হয়তো সকলের বেশি বেশি নিন্দা করার জন্যই।

ওই বইখানা ছিল।

তরুণ আত্মার প্রচণ্ড আর্তনাদের কান্নায়-ভরা বীভৎস মর্মান্তিক বই—সুন্দরের কল্পনায় রঙিন জীবনকে দাঁতে-নখে ছিঁড়ে ফেলে দেহের রক্তমাংস নাড়িভুঁড়ির স্বরূপ দেখিয়ে জীবনকে অতি-বাস্তব আর সুন্দরকে মৃদুতা মিষ্টতা বর্জিত ভীষণরূপে দেখাবার জন্য লেখা বই।

আর ছিল ঠোঙার কতগুলি টুকরো।

আদিম জঙ্গলের প্রান্তে তার এই বুনো কুঁড়েঘরেও শহরে ছাপানো খবরের কাগজের টুকরা দিয়ে তৈরি করা ঠোঙা পৌঁছে গেছে।

জগদীশ পর্যন্ত টের পেয়ে জেনে গিয়ে আমোদ বোধ করেছে যে খবরের কাগজের দৈহিক গতির পরিণতি মুদিখানায় মাল বেচার ঠোঙায়।

মাঝে মাঝে কখনও-সখনও দু-একটা ঠোঙা ছিঁড়ে জগদীশ দু-একটুকরো খবরে চোখ বুলোত।

সেদিন রাত্রে তরুণের বইটা পড়ে খুঁজে খুঁজে ঠোঙা আর ছেঁড়া ছাপানো কাগজের টুকরো সংগ্রহ করে তন্নতন্ন করে পড়ে রাতটা ভোর করতে চেয়েছিল---

টেরও পায়নি কখন রাত ভোর হয়ে গিয়েছিল। কখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে গিয়েছিল রোদ উঠবার আগের স্নিগ্ধ আলো।

জীবনের বিচিত্র শব্দের ছাপা মন্ত্রে ডুবে গিয়েছিল মরণের ব্যথার নীরবতা।

তারপর দু-মাসের মধ্যে জগদীশের কুঁড়েতে বই জমেছে শ-পাঁচেক।

তিন-চারখানা আস্ত দৈনিক খবরের কাগজ তার কুঁড়েতে পৌঁছায়—অনিয়মিতভাবে। তবে পৌঁছায়।

কী তাড়াতাড়িই যে নাম ছড়ায়। কীভাবে যে বেড়ে চলে ভক্তের ভিড়।

প্রবোধ প্রায় নির্জন দেখে গিয়েছিল বন্ধুর কুঁড়ে—এক বছর পরে সেই কুঁড়েঘরের কাছে তোলা নতুন প্রকাণ্ড আটচালাটা ছুটির দিন ভক্ত সমাগমে জনাকীর্ণ হয়ে থাকে !

আটচালাটা প্রতাপ করে দিয়েছে। জগদীশ থাকে তার আদিবাসীদের ছোটো ভাঙা কুঁড়েটাতেই।

অন্য প্রসঙ্গে ছাড়া ধর্মের কথা ভক্তি-বিশ্বাসের কথা বলে না। চমকপ্রদ অথবা মর্মগ্রাহী কোনো দার্শনিক মতবাদ প্রচার করে না। যখন যে মেজাজে থাকে সেই মেজাজে যা মনে আসে তাই বলে অথবা চুপ করে থাকে, যেমন খুশি ব্যবহার করে সকলের সঙ্গে। নেশার জের টানা মেজাজটা বিগড়ে থাকলে সকলকে ধমকে গালাগালি দিয়ে কিছু আর রাখে না।

তার ধমক-ধামক গালাগালি শহরেব ভদ্র পদস্থ ধনী ভক্তরা পর্যন্ত মাথা নত করে মেনে নেয়। আরও ভক্ত বেড়ে যায়। প্রথমে জগদীশ ব্যাপারটা একেবারেই বুঝতে পারেনি।

সে যোগীও নয়, সাধকও নয় ! বরং অতি অপদার্থ মানুষ। সে তো শুধু চিত্রার জন্যে নিজের অসহনীয় মনোবেদনা নিয়ে কাতরায়, নিজেকে অভিশাপ দেয়, সোজাসুজি আত্মহত্যা করতে পারে না বলেই বেপরোয়া নেশা চরমে তুলে চব্বিশ ঘণ্টার অর্ধেকের বেশি সময় ব্যথাবোধের শক্তি হারিয়ে দিন কাটিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মরে যেতে চায়---সচেতন থাকার সময়টুকু শুধু আবোল-তাবোল এলোমেলো চিন্তা করে। তবু কেন এত প্রত্যাশা নিয়ে এত মানুষ তার কাছে আসে ?

শুধু এই প্রশ্ন নয়।

জগদীশ সব চেয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় এই ভেবে, যে মানুষের সমাজ ত্যাগ করে নির্জন অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছে একা থাকার জন্য, অথচ মানুষ এসে ভিড় করে তার নির্জনতা ভঙ্গ করলেও তার খারাপ লাগে না।

বিকালের দিকে সে অবশ্য ভাগিয়ে দেয় ভক্তদের। সন্ধ্যাবেলা এখানে কারও থাকার অধিকার নেই।

রাত্রে বাঘ আসে, অন্য হিংস্র জন্তুরাও আসে—ওই খোলা আটচালায় কারও রাত কাটানো চলবে না।

জগদীশের ভয় নেই, তাকে বাঘে খেলেও কিছু এসে যায় না। কিন্তু সে অন্য কারও প্রাণরক্ষার দায় নিতে পারবে না।

এ বিষয়ে এমনই কঠোর জগদীশ, এমনি নিষ্ঠুরের মতো সে বিকাল হতেই সকলকে খেদিয়ে দেয় যে ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকি থাকে না তার ভক্তদের !

সন্ধ্যা থেকে শুরু হবে যোগসাধনা। তাদের মতো অধম ব্যক্তিদের জন্য সারাটা দিন দিতে পারে কিন্তু যোগসাধনায় তো তারা ব্যাঘাত ঘটাতে পারেন না—তাদের জন্যই তো যোগসাধনা !

ভক্তেরা নিজেরাই তার নিয়মের মর্যাদা রাখে। দু-একজন বিভ্রান্ত বদলোক রাত্রে জগদীশ কী করে সচক্ষে দেখতে চাওয়ার অদম্য কৌতূহলে চালাকি করে থেকে যাবার চেষ্টা করলে তারাই তাকে শায়েস্তা করে সঙ্গে নিয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর দশ-বারোজন বুনো মানুষ এসে জগদীশেব কুটিরের সামনে জড়ো হয়—তাদের আদিম অস্ত্রশস্ত্রগুলিও নিয়ে আসে।

শীতের রাত্রে আগুন জ্বালায়।

গ্রীষ্মের রাতেও আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থাটা রাখে।

শুকনো গাছ-পাতা ডালপালা দাউদাউ করে জ্বলে উঠলে বাঘ ভালুক হিংস্র পশুরা শুধু যে ভয়ে দূরে পালিয়ে যায় তা নয়, কয়েক দিন আর এদিকে ঘেঁষে না।

তারা কিছু জানতে চায় না, কিছু বুঝতে চায় না। এই পৃথিবী এই জীবন সার কি অসার, মায়া কি বাস্তব, জন্ম-মৃত্যুর রহস্যের আসল মানেটা কী—এ সব কোনো জিজ্ঞাসা তাদের নেই।

নেশা চড়িয়ে জগদীশ একা অন্ধকারে বিপজ্জনক পথ ধরে জলপ্রপাতে যায়, পাথরের গায়ের কত শত বছরের শ্যাওলা-ধরা পিছল পাথরে নির্ভয়ে অনায়াসে পা ফেলে এগিয়ে যায়, প্রমত্তা প্রপাতের জলধারা দু-হাতে তুলে নিয়ে নিজের মাথায় ঢালে।

বাঘ কাছে আসে না। ধারেকাছেও ঘেঁষে না।

তার পা পিছলে যায় না—এমন চড়াই-বড়াই মেশানো নেশা করেও।

মাঝরাত্রি পর্যন্ত চুপচাপ একটা পাথরে বসে থেকে আবার নিবাপদে কুঁড়েতে ফিরে আসে।

এই দেবতা এসে এই কুঁড়েতে ছদ্মবেশে আশ্রয় নিয়েছে বলেই তো এবার শিকাব মিলছে ভালো, ফসল ফলছে ভালো।

শহর থেকে বাবুর দল ভিড় করে এসে কতকিছু কিনে তাদের কত বাড়তি পয়সা দিচ্ছে।

দেবতার ঘরের সামনে দশ বারোজনকে পাহারা দিতেই হবে।

দেবতা কৃপণ নয।

চোলাই আর মহুয়া রস জিরাইকে দিয়ে যথেষ্ট সরবরাহ করে, তাদের সাধ মিটিয়েই করে।

এ অবস্থায় একদিন সন্ধ্যার পর রত্নাকবের একেবাবে কুটিরের মধ্যে ঢুকে পড়া কী করে সম্ভব হল জগদীশ প্রথমে বুঝতে পারে না। ঠিক পাগলের মতোই চেহারা। উশকোখুশকো চুল, মুখে তামাটে রংয়ের তরুণ বয়সের অপক্ক অল্প গোঁফ দাড়ি, ধবধবে ফরসা। কলারযুক্ত একটা শার্ট এবং হাফ প্যান্ট। জগদীশ রেগে উঠে শান্তি বিঘ্ন করার জন্য তাকে ধমকাতে যাবে, সে বোতাম খুলে শার্টের কলারটা ঢিল করে দিতে দিতে বলে, একটা বই দিতে এসেছি, আমার নিজের লেখা, একটা কবিতার বই।

নেশা তখনও মাথায় চড়েনি।

বিচারবিবেচনা জগৎ-সংসার লোপ পায়নি ক্লান্ত আত্মাব আত্মসম্মোহনের বীভৎসতায়।

জগদীশ বলে, বই ?

রত্নাকর বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নিজের লেখা একটা কবিতার বই। আপনাকে উপহার দিতে এসেছি।

প্রণামি নয় !

উপহার !

একটা ভয়ংকর কবিতার বই লিখেছে স্পিড-উন্মাদ তরুণ, নিজেকে সে নাস্তিক বলে ঘোষণা করে, তবু সেও প্রণাম করেই বইটা তার পায়ের কাছে রেখেছিল।

জগদীশ মিনিট তিনেক গুম খেয়ে থাকে।

চেতনাকে মন্ত্রবলে আত্মস্থ করার সব চেয়ে তেজি আর জোরালো মেশানো নেশার বাঁশের চোঙাটার দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্তে কত কথাই যে ভাবে জগদীশ, কত কিছুই যে অনুভব করে হৃদয় দিয়ে।

তাপ্পি নীরবে কুঁড়েতে এসে দামি বিলাতি আর দেশি মদের বোতল দুটো তার পাশে মেঝেতে নামিয়ে রাখে।

পাগল আগন্তুক তাকিয়েও দেখে না তাপ্পির দিকে।

দেশি মদের গালা-আঁটা শোলার ছিপি খুলে তাপ্পিই লাগিয়ে দিয়ে যায় বিলাতি বোতলের কর্কের ছিপি।

বোতল তুলে ছিপি খুলে অনেকটা নির্জলা শরাব জগদীশ গলায় ঢেলে দেয়।

কয়েকবার হিক্কা ওঠে। কয়েকবার সে কাশে।

তারপর সে বলে, কী চাও ?

একটু শান্তি চাই।

তুমি জানো না সন্ধ্যার পর আমি কারও সঙ্গে কথা বলি না ?

জানি !

সন্ধ্যার পর ওরা তো কাউকে আসতে দেয় না আমার কাছে ? তুমি কী করে এলে ?

ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে এসেছি। একটু বানিয়ে বললাম, আমি আপনার গুরুভাই—গুরুদেবের হুকুমে জরুরি কথা বলতে এসেছি।

রত্নাকর একটু হাসে। তার রুক্ষ মলিন মুখে এমন মরিয়া আর বেপরোয়া দেখায় হাসিটা।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী ? এভাবে আমার সঙ্গে দেখা করার মানে ?

পেটে অনেকখানি কড়া ওষুধ পড়েছে, সবে শুরু হয়েছে ক্রিয়া। এবার খানিকটা উদার মনে হয় জগদীশকে।

ওই যে বললাম, একটু শান্তির খোঁজে এসেছি। প্রাণে বড়ো যন্ত্রণা—যদি কোনো উপায় করে দিতে পারেন। আপনি যোগী মানুষ, জ্ঞানী মানুষ—আপনার হয়তো জানা থাকতে পারে।

প্রাণে কীসের যন্ত্রণা, কেন যন্ত্রণা খুলে বলো ! শুধু নাম বললে রত্নাকর—

ওটা বানানো নাম। আমার কোনো নামও নেই, পরিচয়ও নেই। আমি একটা ভবঘুরে—তিন বছর ধরে শুধু একটু শান্তির জন্য পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি মহাপাপী, এটাই আমার একমাত্র পরিচয়।

কী পাপ করেছ ?

দুটো মানুষকে খুন করেছি। একটি নির্দোষ মেয়ে আর একটি ছেলেকে। মেয়েটাকে আমি ভালোবাসতাম।

জগদীশ হঠাৎ বজ্রগর্জনে ফেটে পড়ে : আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে এসেছ ? তামাশা করতে এসেছ ? জানো আমি হুকুম দিলে ওরা তোমায় টুকরো টুকরো করে কেটে জঙ্গলে পুঁতে ফেলবে ?

রত্নাকর ভয় পেয়েছে মনে হয় না। সে শুধু একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই জগদীশের ক্রোধে বিকৃত মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ধীরে ধীরে বলে, এত চটবার কারণ কী হল ?

জগদীশ গর্জন করেই বলে, আমি বুঝিনি ভেবেছ ? চেনা লোক কারও কাছে আমার কথা সব শুনে একটু ইয়ার্কি মারতে এসেছ, বুঝি না আমি ?

রত্নাকর খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো চেয়ে থাকে।

আপনার ব্যাপার জেনে তামাশা করতে এসেছি ? আপনিও কোনো মেয়েকে ভালোবাসতেন নাকি ? না বুঝে না জেনে জেলাসিতে হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে তাকে খুন করেছিলেন নাকি ?

জগদীশ গুম খেয়ে থাকে। ভাবে, জিরাইদের ডেকে বজ্জাতটাকে বেঁধে রাখতে বলবে ?

চিত্রার ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে সত্যিই তামাশা করতে এসেছে কি না দিনের বেলা সাদা চোখে সেটা যাচাই করে স্থির করবে ওকে নিয়ে কী করা উচিত ?

রত্নাকর আবার তার মরিয়া বেপরোয়া হাসি হাসে।

এ তো বেশ যোগাযোগ হয়েছে ! যোগী আর ভবঘুরের যোগাযোগ। প্রিয়াকে খুন করে আপনি হয়েছেন যোগী আর আমি হয়েছি ভবঘুরে।

জগদীশ হঠাৎ সুর পালটায়, নরম সুরে জিজ্ঞাসা করে, সত্যি বলছ আমার সঙ্গে তামাশা করতে আসোনি ?

রত্নাকর আপশোশের আওয়াজ করে বলে, এভাবে এমন সময়ে এ রকম তামাশা করতে কেউ আসে ? যে কবিতা লেখে, আর বন্ধু নিজের খরচে ছদ্মনামে যার কবিতার বই ছাপিয়ে দেয় ? পাক খেতে খেতে এদিকে এলাম, শুনলাম একজন অল্পবয়সি সিদ্ধযোগী অনেক পাপী-তাপীকে শান্তি দিয়েছেন। ভাবলাম দেখেই আসি, এঁর কৃপায় যদি একটু শান্তি পাই।

রত্নাকর জোরে জোরে মাথা নাড়ে। এতক্ষণের আপনি বলাটা হঠাৎ তুমি বলায় পরিণত করে বলে, না দাদা তোমার কাছে কোনো আশা নেই। তোমার দ্বারা হবে না। তোমার নিজের জ্বালাই এখনও সামলাতে পারোনি, আমার জ্বালা তুমি জুড়োবে !

সত্তর বছরের প্রতাপকে জগদীশ প্রথম থেকে তুমি বলেছে, প্রতাপ তাকে মনে-প্রাণেও তুমি বলার কথা ভাবতে পারেনি। গেলাসে খানিকটা রঙিন মদ ঢেলে জগদীশ গেলাসটা এগিয়ে দিয়ে বলে, হবে ?

না। ও সব সস্তায় কিস্তিমাতের ধার ধারি না। প্রাণের আগুন চাপা দিলে কি নেভে ? ধুঁকে ধুঁকে আরও বেশি দিন জ্বলবে, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালচে মেরে যাবে প্রাণটা। চিতা জ্বলতে দেওয়াই ভালো। দাউদাউ করে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে নিভে যাবে।

প্রাণটাকেও পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে যাবে তো ?

প্রাণ কখনও পোড়ে ? সোনার মতো যত পোড় খায় তত খাঁটি হয়। তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে কালচে মেরে পোড়ার চেয়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়া ভালো।

পাগল হওয়া ?

অনেক দিন ধরে পাগল হতে হতে আরও দশজনকে পাগল করার চেয়ে সোজাসুজি পাগল হয়ে যাওয়া ঢের ভালো। নিজের বিষটা নিজেই ভোগ করলাম। আমার জ্বালাটা আমারই রইল।

আমি কিন্তু কাউকে ডাকিনি। লোকে যেচে এসে ঝঞ্ঝাট করলে আমি কী করব ?

ডাকোনি ? সব কিছু ত্যাগ করে বনে এলে, সবাইকে ডাক দিলে না যে দ্যাখো আমার কাণ্ড কারখানা ? আয়-আয় তুতু করে ডাকটাই বুঝি একমাত্র ডাক ? অন্যভাবে ডাকাডাকি নেই জগতে ?

আমার ব্যাপার জানো না তাই—

তোমার ব্যাপার বুঝতে পারছি বইকী। আমি নিজের হাতে প্রিয়াকে খুন করে হয়েছি ভবঘুরে, তুমি যোগী হয়েছো তোমার জন্য তোমার প্রিয়াকে খুন করতে হয়েছে বলে।

মাথা ঘুরছিল জগদীশের। দেশি বোতলটার দিকে হাত বাড়িয়েও সে হাত গুটিয়ে নেয়।

হাঁক দিয়ে জিরাইকে ডেকে আনে।

মেশালো বুনো ভাষায় জানায়, গুরুভাইয়ের থাকার ব্যবস্থা করে দাও। কোনো কষ্ট যেন না হয়।

মহুয়ার খাঁটি গ্যাজানো রসের চোঙাটা হাতে নিয়ে জগদীশ এগিয়ে যায় জলপ্রপাতের দিকে।

পাহাড়ের গা বেয়ে জলের ধারার হঠাৎ অনেক নীচে ঝাঁপিয়ে আছড়ে পড়ার আওয়াজ চব্বিশ ঘণ্টাই শোনা যায়।

যত কাছে এগোনো যায় ততই যেন গর্জন বাড়ে ঝরনায় আছাড় খাওয়ার।

প্রকৃতি যেন প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে প্রকৃতিজয়ী তাকে পরাজয় মানাতে চাইছে।

ঝাঁপিয়ে পড়বে ? নিমেষে শেষ করে দেবে বাঁচার কষ্ট ? মিশে যাবে চিত্রার সঙ্গে একাকার হয়ে ?

ঝাঁপ সে দিতে পারে অনায়াসেই। মরণ তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে জীবন-মরণের ছেলেখেলার মতোই।

কিন্তু কোনো মানে হবে কি এভাবে মরার ? মরে গেলে সব ফুরিয়ে যায়, চুকে যায় বাঁচা-মরার হিসাবনিকাশ, শূন্যে মিশিয়ে যাবার পর জল বায়ু আকাশ পৃথিবীতে মিশে যাবার পর জগতে ঘটে চলবে প্রকৃতি আর জীবনের ইতিহাস, মানুষ আর প্রকৃতির একটানা লড়াই, কিন্তু অসংখ্য মৃতের মতো সেও মিলিয়ে থাকবে চেতনাহীন মহাশূন্যে।

জীবন থাকবে পৃথিবীতে।

প্রপাতের জলস্রোতে ঝাঁপ দিলে কয়েক মিনিটে সে চিত্রার মতোই মিলিয়ে যাবে ওই আদিম উপকরণে।

এখনও সে জীবন্ত।

চিত্রা মরেছে।

মরণের চেয়ে বড়ো সত্য জীবনের জানা নেই। মরব জেনেই বাঁচা। মরে মরে মরাকে জয় করে বাঁচাই জীবনের ধর্ম।

যত ভক্ত আসে যায়, এসেছে গিয়েছে, তাদের স্মরণ করে মাথায় হাত দিয়ে জগদীশ সেই পাথরে বসে পড়ে যে পাথর থেকে হঠাৎ তাকে দেখে দু-পা পিছু হঠতে গিয়ে চিত্রা শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিল।

নেশার ঝোঁকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মরে চিত্রার সঙ্গে জলবায়ু মাটিতে একাকার হতে চেয়েও জগদীশ ভুলতে পারে না সে জীবন্ত।

মরণকে জয় করে চলাই হল জীবন।

জীবন আর কিছুই নয়।

- সে জীবন্ত। এই জলপ্রপাতে ঝাঁপ দিয়ে সে মরণজয়ী জীবনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে ?

মৃত্যুর হিসাবে পাপপুণ্য সমান, বিশ্বাস রাখা আর বিশ্বাসঘাতকতাও সমান। দুই বিপরীতের সংঘাতই জীবন, জগতে মরণ-বাঁচন।

সে জীবন্ত।

বাঁচার চেষ্টাই তার চরম সার্থকতা—পিঁপড়ে থেকে মানুষের বাঁচার চেষ্টাই একমাত্র ধর্ম।

জীবাণু বীজাণুও যে জীবন জগদীশ তা জানত। কিন্তু সে ভাবে অনুবীক্ষণে দেখা এই সূক্ষ্ম জীবনগুলিই কি শেষ কথা ? এর চেয়ে সূক্ষ্মতর জীবন যে নেই তার প্রমাণ কী ?

জীবন যেমন হোক, জীবনের স্থূল আর সূক্ষ্ম দিক খানিক খানিক জেনেছিল বলেই জগদীশ কিছুতেই সেদিন জলপ্রপাতের উপরের পাথর থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিত্রার সঙ্গে একাকার হয়ে ব্যথার পূজা সাঙ্গ করতে পারেনি।

# সপ্তম অধ্যায়

বাইবেব লোক হিসাবে ভবঘুবে বত্নাকবই সর্বপ্রথম জগদীশেব আশ্রমে ঠাই পেল।

শিষ্য হিসাবে নয়, ভক্ত হিসাবে নয, আশ্রিত হিসাবেও নয় -- এক রকম অতিথি হিসাবে। এবং জগদীশেরই আমন্ত্রণে !

রত্নাকর মোটামুটি তাব কাহিনি বলেছে। প্রেমেব সেই চিবকেলে তিনকোণা ঝঞ্ঝাটের কাহিনি।

ভয়ানক ভাবপ্রবণ আব রাগী ছিল বত্নাকব। হঠাৎ আরেকজনের সঙ্গে মেয়েটার ঘনিষ্ঠতা দেখে মাথা গিয়েছিল বিগড়ে এবং দুজনকেই বিষ খাইয়ে খুন করেছিল।

খুঁটিনাটি জেনে দরকাব নেই জগদীশের, দুজনকে মারাত্মক বিষ খাওযাবার সুযোগ-সুবিধা ছিল বলেই বিষ খাইযেছিল—নইলে অন্য উপায়ে খুন কবত, হয়তো গুলি কবে মারত।

ঠিক করেছিলাম নিজেও মরব, কিন্তু দাদা পাবলাম না। কিছুতেই পাবলাম না।

পাগল না হলে আত্মহত্যা কবা যায না। নইলে এত দুঃখ-কষ্ট সয়ে এত মানুষ বেঁচে থাকত ?

পাগল তো হযেই গিয়েছিলাম। নইলে ওদের মারতে পারতাম ?

অন্যকে মারতে পাগল হতে হয না, হিংসা মাথায চড়ে গেলেই মানুষ মাবতে পারা যায়। একটা যুদ্ধে জগতে কত লোক খুন হয জানো না ?

যুদ্ধ আলাদা ব্যাপাব। সৈন্যেবা তো নিজের নিজেব ব্যক্তিগত স্বার্থে শত্রু মারে না।

ব্যক্তিগত স্বার্থেই যুদ্ধ বাধে। সৈন্যরা ব্যক্তিগত স্বার্থেই বাঁচার জন্য যুদ্ধে নামে।

বাঃ ! এটা কী বকম কথা হল ? দেশ আক্রমণ কবলে দেশবক্ষার জন্য সৈনিক হযে যুদ্ধে নামলে সেটা হবে ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপাব ?

হবে বইকী। আমার দেশ বাঁচলে আমি বাঁচব—এই তো সোজা হিসাব। এখানে দেশেব স্বার্থ নিজেব স্বার্থ এক হযে গেল। শত্রুবাও মানুষ—কিন্তু তখন যত বেশি শত্রুকে খুন করতে পাবব দেশকে তত বেশি বক্ষা করতে পারব। যুদ্ধেব সময যে সৈনিক যত বেশি শত্রু-মানুষ খুন কবতে পাবে তাব তত বেশি গৌবব, নিজেবও তত বেশি অহংকার।

সাবাদিন ভক্তদেব নিযে জগদীশ ব্যস্ত থাকে। রত্নাকবেব সঙ্গে কথা শুবু হয় সন্ধ্যার সময—সাবাদিন মহাপুবুষ হযে জীর্ণ দীর্ণ দুঃখী মানুষেব ঝামেলা সামলে জগদীশ যখন জীবনের জীর্ণ পুরাতন সিসাকে নিমেষে সোনাব ববণ ধাবণ কবাবাব চেষ্টা শুবু কবে। বোতল আর গলায় কাত করে না জগদীশ।

সচেতন থেকে রত্নাকরেব সঙ্গে কথা বলা চালিয়ে যাবার জন্য একটু একটু বিষ খায়, চুমুক চুমুক খায়।

সারা জগতের জীবনসমুদ্র মন্থন করা বিষ এক চুমুক গিলে পেটে নিয়ে নীলকণ্ঠকে হার মানাবার প্রয়োজন যেন তার ফুরিয়ে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সবে জগদীশ শুবু করেছে নেশার পালা, আজ মেশানো নেশা করবে না, নেশা চড়াবে না এই ইচ্ছা নিয়ে—জিরাই এসে খবর দেয় ললিতা তার দর্শন চায়।

লালিম বিলাতি মদ—কলসিতে এনে রাখা প্রপাতের জল অল্প একটু মিশিয়ে দিতে পাতলা হালকা দামি কাঁচের গেলাসে যেন রঙিন হয়েছে অমৃতের মতো !

একটা চুমুক দিয়ে গেলাস সামনে নামিয়ে রেখে সে বলে, লে আ বেটিকো।

জিরাই একগাল হাসে।

ললিতা কুঁড়েতে ঢুকে হাঁটু পেতে বসে গলায় আঁচল জড়িয়ে তাকে প্রণাম করতে যায়।

তাড়াতাড়ি তুলে না নিলে গেলাসটা উলটে যেত।

এদিকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ললিতা প্রণাম করে, ওদিকে জগদীশ এক নিশ্বাসে খালি করে দেয় গেলাসটা!

ললিতা মাথা তুলছে না দেখে মিষ্টিসুরে বলে, মা, ছেলেকে বাবা করে আজ মেয়ে হবার মতলব নিয়ে এসেছ?

ধীরে ধীরে মাথা তোলে ললিতা। ধীর শান্ত কণ্ঠে ললিতা বলে, হ্যাঁ, মেয়ে হয়েই বাবার কাছে এলাম—মতলব নিয়েই এলাম। জগদীশ প্রসন্ন হাসি হেসে বলে, সেটা বুঝেছি। মুশকিল আসানের মতলব না নিয়ে কেউ আসে না আমার কাছে। রোগ শোক দুঃখ বিপদ—আমি যদি সামলে দিতে পারি। যত বলি পারব না, ও সব আমার জানা নেই, তত বেশি চেপে ধরে—তত বেশি কাঁদাকাটা করে।

ললিতা সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনাব ও রকম সস্তা ভড়ং নেই। ও সব চেয়ে আপনাকে জ্বালাতন করতে আসিনি।

তবে?

দেহটা নিয়ে পড়েছি মহা বিপদে। বিশ্বাস করুন, আমি জানতাম না। খাই দাই ঘুমাই, দিব্যি সুস্থ শরীর, বিয়ে হবার আগে টেরও পাইনি স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করার সুখ আমার জন্যে সৃষ্টি হয়নি। জগতের ও সব সুখের জন্য আমার জন্ম হয়নি।

ও সব সুখ চাও না?

চাই না? চেয়ে চেয়ে পাগল হয়ে যেতে বসেছি। দেহটা জানিয়ে দিয়েছে ও সুখ আমার কপালে নেই।

মা হতে চাও না?

ধৈর্য হারিয়ে ললিতা চিৎকার করে ওঠে, হাজারবার মা হতে চাই, হাজারবার হতে চাই।

তবে?

ললিতা খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করে থাকে।

এই নাকি নমুনা অসীম জ্ঞানী পরমসাধক মানুষটার?

এভাবে এসে এত কথা বলার পরেও বুঝতে পারছে না তার আসল কথা?

অথবা বুঝেও ভান করছে না-বোঝার?

সে তো একা নয়।

তার মতো অনেকের কথা শুনতে হয় বুঝতে হয়।

স্পষ্ট করে সে বলেনি তার বিপদের কথা, আভাসে ইঙ্গিতে বলেছে। ধরে নিয়েছে একটু ইঙ্গিত দিলেই মহাপুরুষ বুঝে নেবেন তার আসল সমস্যা!

মাথা না তুলেই মৃদুস্বরে ললিতা বলে, পরশু উনি আসবেন লিখেছেন। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। আমার দেহে খুঁত আছে উনি জানেন না, বোঝেনও না। আমিও জানতাম না বিয়ের আগে। এখন জানতে বুঝতে দিতে সাহস হয় না—ভাববেন আমি ঠকিয়েছি! কী করে বসবেন কে জানে! আমি কী করব বলে দিন—আমায় বাঁচান।

জগদীশ গভীর স্নেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়, সে যেন ছোটো কচি মেয়ে এমনিভাবে তার কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। বলে হ্যাঁ, তোকে বাঁচাব। তুই ভীরু নোস, লাজুক নোস, ঢং করিস না—তোকে না বাঁচালে চলে!

কী করব?

আলোক তোকে ভালোবাসে ?

ভীষণ ভালোবাসে।

বিপন্না বিষণ্ণা ললিতার মুখে ভালোবাসার ভীষণ বিশেষণ জগদীশকে হাসায় না। তাপ্পি যথাসময়ে তার নেশা আর খোরাকের আযোজন করে দিতে এলে সে গর্জন করে বলে, ছুটি দিইনি তোকে ? বলিনি ছেলে বিইয়ে গায়ে জোর পেলে কাজে আসবি ? ঘবে বসে মাইনে পাবি ?

তার ধমকে বিশেষ কাবু হয না তাপ্পি।

এত তাডাতাড়ি কোনোদিন নেশা চড়াযনি, এত বেশি বিলাতি মাল গেলেনি। নেশা যেন পলকে পলকে লাফ দিযে চডতে থাকে। আসন্ন মাতৃত্বেব ভারে তাপ্পির নড়াচড়া মন্থর হয়েছে। ধীবে ধীবে সে টুকিটাকি কাজগুলি সাবে—রাত্রে জগদীশেব যা কিছু প্রয়োজন হতে পারে গুছিযে ঠিকঠাক করে বাখে। আজ শুধু বিলাতি খাচ্ছে দেখে মাযের মতো স্নেহের সুরে জিজ্ঞাসা করে, মাংস খাবি বাবা ?

মাথা নেডে তাব প্রশ্নের জবাব দিয়ে জগদীশ ললিতাকে বলে, আমি তোকে পরীক্ষা কবব।

ভীতা স্তম্ভিতা ললিতা চেয়ে থাকে।

ভয় কী ? লজ্জা কী ? ডাক্তাবেব কাছে গেলে ডাক্তাব পরীক্ষা কববে না ?

ডাক্তাবেব মতো তাকে পরীক্ষা কববে ! ভয়ে ললিতা যেন কুঁকড়ে যায়।

তাপ্পিকে যেভাবে ধমকে দিযেছিল প্রায় সেইভাবে ধমক দিয়ে জগদীশ বলে, আমাকে তুই মানুষ ভাবিস, পুরুষ ভাবিস ? আমাকে তুই ভয করিস ! আমাব কাছে তোর লজ্জা !

ললিতা উঠে দাঁড়ায। কাতব কণ্ঠে বলে, আমি আজ যাই বাবা।

জগদীশ গর্জন করে ওঠে, না যেতে পাবি না। আমাকে তুই ঠকিযেছিস, গেঁয়ো মেযের চেযেও বোকাহাবা লাজুক হযেও দেখিযেছিস তুই কডা মেযে, শক্ত মেযে। লজ্জায় ভয়ে এতকাল একটা রোগ পুষে বেখেছিস মুখ বুজে। তোর লজ্জা ভয় ভেঙে দেব আজ। তোর রোগ সারিযে দেব।

ভীতা চকিতা হরিণীর মতো ছুটে পালাতে গিযে কুঁড়েব বাইরে দাঁডানো রত্নাকরের গাযে ধাক্কা লেগে আছাড় খেয়ে ললিতা পড়ে যায়।

কুঁড়েটা জলপ্রপাতের ধারে হলে সেও চিত্রার মতোই জলের সঙ্গে পাল্লা দিযে নীচে আছড়ে পডত।

আঘাত লেগে ললিতা অজ্ঞান হয়নি, মূর্চ্ছা গিযেছিল।

দ্বিধামাত্র না কবে বত্নাকব তাকে তুলে কুঁড়ের মধ্যে নিয়ে যায়, মাটির মেঝেতে শুইযে দিয়ে মাথায় জল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, তাপ্পি, ক-টা মেয়েকে ডেকে আন চটপট। মেযেছেলে ঘিবে আছে দেখে ভবসা পাবে।

আট-নজন নানাবযসের নিকষ কালো বুনো মেয়েমানুষ রত্নাকবেব ইঙ্গিতে কুঁড়েব মেঝেতে বসে, আবও কয়েকজন কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপব মূর্চ্ছা ভেঙে যায ললিতার। উঠে বসে সে বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায় !

রত্নাকর হেসে বলে, তুমি এত ভীতু কেন গো বোন ?

খুব তাড়াতাড়িই মূর্চ্ছাভঙ্গের বিহ্বলতা কেটে যায়। নিজেকে এখানে এ অবস্থায় দেখে তাড়াতাড়ি মনে পড়িয়ে নিতে হয় সব কথা।

ললিতা মাথা হেঁট করে।

রত্নাকর এবার অনুযোগ দিয়ে বলে, এত ভক্তি কবো বাবাকে, বাবার নিয়ম-নীতিব খবর রাখো না ? কত আটঘাট বেঁধে বাবা বিষ খায় জানো না ?

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

কী করে বুঝবে ? বাপকে চিনবে না, বাপের রীতিনীতি জানবে না, আসবে শুধু আবদাব জানাতে। বাপকে রাগিয়ে দেবে, বাপের উগ্রমূর্তি দেখে মূর্চ্ছা যাবে।

ললিতা চুপ করে থাকে।

রত্নাকর ধমকের সুরে বলে, বাবার হুকুমে আমরা একজন-দুজন সন্ধ্যা থেকে সারারাত দুয়ারের কাছে পাহারায় থাকি জানা তোমার উচিত ছিল। বাবা নিজে হুকুম দিয়েছে—কড়া হুকুম। যে মানবে না তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না বাবার। বিষ খেতে খেতে মাথা বিগড়ে গেলে, বিভ্রম ঘটলে, বাবাকে যেমন করে হোক সামলাতে হবে। মারবার হুকুম আছে, বেঁধে রাখার হুকুম আছে।

কে জানে জগদীশ কিছু শুনছে কি না, তাদের দিকে চাইছে কি না ! মশগুল হয়ে অন্য কথা ভাবতে ভাবতেই সে যেন বিলাতি মদের বোতলটার পাশে সাজানো তাড়ির হাঁড়িটা টেনে নিয়ে হাঁড়ির কানায় মুখ দিয়ে পান করে। তালের গ্যাঁজানো রসে তার বুক ভেসে যায়।

একনজর তাকিয়ে দেখে রত্নাকর বলে যায়, বাবা কি জানেন না বিষের মজা ? নিজেই তাই পাহারা বসিয়েছেন। বিষের ঝোঁকে খারাপ কিছু করতে গেলে যেভাবে পারি ঠেকাবার হুকুম দিয়েছেন ! বলেছেন কী জানো ? বলেছেন, দরকার হলে মেবে ফেলবি !

হেঁট করা মাথাটা নীরবে জগদীশেব পায়ের কাছে মাটিতে ঠেকিযে ললিতা নীরবে উঠে দাঁড়ায়।

সে কিছু বলে না, তবু রত্নাকব সঙ্গে গিয়ে তাকে রাস্তায় গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে।

রত্নাকর ! মাতাল হয়েছি ?

মাতাল ? এই তো সবে শুরু করলে—এইটুকু খেয়ে মাতাল হবে তুমি ? পাঁড়-মাতালদেব অবিশ্যি এক-একদিন একটুখানি খেয়েই খেপে যেতে দেখেছি—ওটা ব্যারাম। বোগটার কী যেন নাম বলে ডাক্তাররা—হঠাৎ হয়। দিব্যি কথা কইছ, মাতাল হতে যাবে কেন ?

জগদীশের মুখেব ভাব প্রসন্ন এবং প্রশান্ত।

আজ খানিকটা বুঝতে পারছি মানুষ নেশা করে কেন। শুধু বিষ দিয়ে বিষ ঠেকানো নয়। আগে তাই খেতাম প্রাণের জ্বালা চাপা দিতে। এখন খাই দায় ঠেকাতে। এতকিছু চাইছে মানুষ-- ছুটকো ভাবনা-চিন্তা বিচারবিবেচনা কাটিয়ে না উঠে চাহিদা মেটাতে পারি না।

তাকে উপলক্ষ করে নিজের সঙ্গে কথা কইছে জগদীশ। আত্মচিন্তা মুখে উচ্চারণ করছে।

উৎফুল্ল হয়ে রত্নাকর জেঁকে বসে।

যেমন ধরো ললিতার এই ব্যাপারটা। না, বেঠিক কিছু বলিনি, বেঠিক কিছু করিনি। বেটিকে ঠিক এ রকম একটা শক দেওয়া দরকার ছিল। বাপ-ভাই-স্বামী আছে, মা-মাসি-শাশুড়ি-বউদি-বোন আছে, ননদ আছে, সবার কাছে এতকাল গোপন করে রেখেছে রোগটা—চুপিচুপি আমার কাছে এসেছে রোগ সারাতে। ভড়কে দিয়ে ঠিক করেছি। প্রতাপ আর আলোককে ধমকে দিলেই বেটির চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু রত্নাকর—রত্নাকর মুখ খোলে না।

ভাবতে ভাবতে জগদীশ আপনমনে বলে, কোথায় একটা ভুল হচ্ছে, ধরতে পারছি না। জানিস, মনে হচ্ছে, আমায় একদিন নেশা ছাড়তে হবে। সংসার স্পেশাল বাপ বানিয়েছে, এ বাপের দায় থেকে আমার রেহাই নেই।

রত্নাকরও তাই বলে।

বলে, দাদা, সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হলেই কি সংসার রেহাই দেয় ? সংসারটাই তো তোমায় সন্ন্যাসী করেছে। তোমার একটা বিশেষ গুণ আছে, ক্ষমতা আছে—খাপছাড়া পাগল মানুষ তুমি। সংসার বলে, সংসারে মানিয়ে চলতে পারছ না, তুমি তবে সংসার ছেড়েই যাও। খুঁটিনাটি দায় থেকে

রেহাই নিয়ে ভাববে যাও ব্যাপারটা কী। আমরাও বুঝতে চাই ব্যাপার—আমাদের চিন্তা করার সময় কই, ভালোমন্দ সবকিছু ঘাঁটবার সুযোগ কই ? সংসারের মজাতেই মজে আছি দিনরাত। তুমি যাও, নিজের খুশিমতো মন্দির থেকে আস্তাকুঁড় চষে বেড়াও, অমৃতের সঙ্গে বিষ খাও, বনে গিয়ে চিন্তা করো— তোমার ছুটি মঞ্জুর। কিছু কিছু যখন জানতে বুঝতে পারবে, আমাদের জানিয়ে দেবার বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা কোরো !

চিন্তা করার চাকর ?

চাকর নয়— দায়িক। সংসারের দরকারের দায়টা মেনেছ বলেই না এই জঙ্গলে যেচে এলেও তোমার খাঁটি বিলেতি মালের পয়সাটা জুটে যাচ্ছে।

সুদর্শনা অন্যভাবে এই কথা বলেছিল। শুনে রেগে গিয়েছিল জগদীশ।

রত্নাকর গুরুর মতো বলে : দায় না নিলে, ফাঁকি দিতে চাইলে, ঝোলা কাঁধে ভিক্ষে করতে বার হতে হত।

আমার তবে বুজরুকি নয় ?

আরে বাসরে ! এমনভাবে লোকে বুজরুকি চালায় ?

এমন জায়গায় এসে ডেরা বেঁধে শুধু চিন্তা-ভাবনা নিয়ে মেতে থেকে ?

নেশা-ভাং তো করি ?

তোমার খুশি হয় করো ! আর সব তো ত্যাগ করেছ—এভাবে যে বেশিদিন বাঁচবে না সে ভাবনাটা পর্যন্ত ! তুমি নেশা করলে লোকের কী ? জগৎ-সংসার তলিয়ে বোঝার চেষ্টা নিয়ে দিবারাত্রি মেতে আছ, লোকের কাছে তাই যথেষ্ট।

আজ খেয়াল করে জগদীশ একটু আশ্চর্যই হয়ে যায় যে খোলাখুলি আলাপ-আলোচনার মধ্যে ক্রমে ক্রমে রত্নাকরের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা কতখানি বেড়ে গেছে। বিনা দ্বিধায় রত্নাকরের সঙ্গে নিজের সম্পর্কে যে সব কথা নিয়ে আলাপ চালায়, কোনো ভক্তের কাছে ওভাবে ও সব প্রসঙ্গ তোলার কথা সে ভাবতেও পারে না।

ভক্তদের ভক্তি টুটে যাবার আশঙ্কায় কি ? রত্নাকরের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে নিজের সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ চালাতে পারার আগে এ প্রশ্ন মনে এলে জগদীশের মুশকিল হত। নিজের মধ্যে ভক্তদের ভাঁওতা দিয়ে ভুলিয়ে রাখার হীনতা কল্পনা করে বিব্রত হয়ে পড়ত।

রত্নাকরের সঙ্গে অন্য ভক্তদের তুলনা করে সে বুঝতে পেরেছে যে জেনেশুনে ভাঁওতা সে কাউকেই দেয় না। ভক্তদের কাছে এ সব কথা সে এই জন্য বলে না যে ভক্ত যতই বিজ্ঞ আর বুদ্ধিমান হোক, এ সব কথার মর্ম তারা বুঝবে না, এলোমেলো উলটো-পালটা মানে করে নিজেরা শুধু বিব্রত হবে।

কাউকে সে ভক্ত হতে ডাকেনি, কারও কাছে কোনোদিন নিজের অলৌকিক ক্ষমতার ভান করেনি।

তার কোনো গোপনীয়তা নেই, নিজে সে যেমন মানুষ তেমনিভাবে সকলের সামনে আসে। তবু ওরা তাকে ভক্তি করে বলেই ওদের পক্ষে দুর্বোধ্য তার আত্মবিচারে বেচারাদের টেনে নামানোর কোনো মানে হয় না।

জগদীশ খানিকক্ষণ রত্নাকরের দিকে চেয়ে একটু ভাবে। রত্নাকর অনেক বোঝে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তাকেও আশ্চর্যরকমভাবে বুঝে নিয়েছে।

কিন্তু সে যা বলতে চাইছে তার আসল তাৎপর্য কি বুঝবে রত্নাকর ?

অন্য কেউ হলে কথা ছিল, রত্নাকর তার বক্তব্য ঠিকমতো ধরতে না পারলেও অবশ্য আসবে যাবে না।

আমি কিন্তু শুধু নিজের চিন্তাই করেছি বরাবর, কোনো বড়ো কথা নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

রত্নাকর একটু হাসে।

তোমার বিনয় সত্যি বৈষ্ণব-মার্কা দাদা ! এখানে একলাটি এতকাল শুধু নিজের কথাই ভেবেছ ? নিজের কোন কথাটা ভেবেছ ? আমি কে, আমি কী, আমি কেন, আমি কোথায়—এ সব কথা ?

রত্নাকর আবার একটু হাসে।

নিজেকে নিয়ে যেখান থেকে যে কথা ভাবতে শুরু কর—সংসার এসে যাবেই। আমি কে ভাবতে গেলেও ভাবতে হবে মানুষ কে ! আমি একটা মানুষ এখান থেকেই তো ভাবনা শুরু করতে হবে ? মানুষ কে না ভেবে কারও বাপের সাধ্যি আছে পাঁচ মিনিট আমি কে এই ভাবনা চালায় ! সংসারে জন্মে ভাবতে শিখলে সংসারের কাছে—একলাটি আছ বলেই বুঝি জগৎ-সংসারকে বাদ দিয়ে নিজের কথা ভাবতে পারবে ? সমাজ, সংসাব, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ ঈশ্বর,—নিজের কথা তলিয়ে ভাবতে গেলে সব এসে যাবে। পাপীরও এসে যাবে, সাধুরও এসে যাবে।

তুই এত জানিস, এত বুঝিস, তবু শান্তির খোঁজে এসেছিলি আমার কাছে !

অনেক জানলেই কি হয় ? আসল জানাটা জানলাম কই ! তুমি আমার চেয়ে অনেক গুণ বেশি জানো, এই ক-টা দিনে আমার কত ভুল-জানা যে শুদ্ধ করে দিয়েছ তার ঠিক-ঠিকানা নেই ! কিন্তু প্রথম দিনেই টের পেয়েছিলাম তুমি অনেক জানো-বোঝো কিন্তু আসল কথাটা এখনও জানোওনি, বোঝোওনি। মনে আছে বলেছিলাম, তুমি আমার জ্বালা জুড়োতে পারবে না—নিজের জ্বালায় তুমি নিজেই জ্বলছ !

জগদীশ হেসে বলে, সে কী সোজা জ্বালা রে ? জ্বালার চোটে পালিয়ে এলাম, নিজেকে ক্ষয় করে শেষ করব যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।

রত্নাকর বলে, দাদা, নিজেকে অত তুচ্ছ কোরো না। নিজেকে সিসা ভাবো, অদ্ভুত দ্রাক্ষা রসায়নে সোনা হয়ে ওঠো। কিন্তু দাদা একটা কথা বোঝো না কেন ? তোমার কি শুধু দ্রাক্ষা রসায়ন, দেশি, চোলাই, মহুয়া, সিদ্ধি, গাঁজা দিয়ে সিসার নিজেকে সোনা ভাবার চোট্টামি ?

প্রতিজ্ঞা করে সেদিন জগদীশ শুধু মদ খাচ্ছিল। মদের নেশাও মারাত্মক। কিন্তু মদের একটা গুণ আছে এই যে সিসার স্বার্থের পাল্লায় পড়ে সোনারও নিজেকে সিসা মনে করায় বিপদটা মদ ঠেকিয়ে রাখতে পারে।

জগদীশ বলে, কিন্তু ভাই, আমি তো যোগসাধনাও করি না, ভগবানকেও ডাকি না। আমার কথা আমার ব্যথা কেউ বুঝবে না জগতে। তুমি তো জানোই সব ব্যাপার। নিজের বোকামি পাগলামিতে এই জলপ্রপাতে চিত্রাকে বিসর্জন দিয়েছি বলেই এইখানে এই জঙ্গলের ধারে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে বিসর্জন দেবার জন্যে ডেরা বেঁধেছি। আত্মহত্যা করতে পারলাম না, ভালোবাসার জন্য আত্মহত্যা করলে ভালোবাসাকেই সস্তা করে দেওয়া হবে বলেই পারলাম না। আমায় কেন এত লোক ভক্তি করে, ভালোবাসে ?

জিরাই তাপ্পি কিরপা এবং আরও দশ-বারোজন আদিম মানুষ ভিড় করে আসে। তাপ্পি দুধ আর ফলমূলের ডেলাটা তার সামনে ধরে দেয়।

আজ তাদের সারারাত্রির উৎসব।

জিরাই জিজ্ঞাসা করে, বাবা তু যাবি ?

কেনে যাব নাই রে ?

সকলের খুশি যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রকাশ পায়।

তারপর জগদীশ খানিকক্ষণ কী ভাষায় ওদের কী বলে যায় একটানা, রত্নাকর বুঝতে পারে না। সকলের ভাব দেখে টের পায় দেবতার কাছে এসে দেবতার কথা শুনে আরও বেশি খুশি হয়ে তারা তাদের আদিম অসভ্য উৎসবের আনন্দে মাততে চলেছে।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে জগদীশ লাল পানীয়ের কাচের পাত্রটা সরিয়ে রাখে। মাটির গেলাসে চোলাই ঢেলে এক চুমুকে খেয়ে ফেলে।

লাল পানীয়ের কাচের গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে রত্নাকর বলে, আমিও শিষ্য হলাম, ভক্ত হলাম। এই কিন্তু প্রথম আর শেষ। নেশা আমার পোষায় না।

কেন ? খেতে বলেছি তোকে ? মাতলামি-পাগলামি করলে তোকে কিন্তু আমি—

মেরে ফেলবে ? ওদের দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে বনে পুঁতে ফেলবে ? তাই যদি তুমি পারতে দাদা তবে পিরিতের খাতিরে এই বন-গাঁয়ে এসে আত্মসাধনা করতে না ! আজ ক-বছর চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি, তোমার এই জঙ্গলে এসে আমিও ঠেকে যেতাম না।

অর্ধউলঙ্গ বুনো কালো মানুষগুলি একটা উৎসব করবে, তারই প্রস্তুতি চলছে। ওদের কত সামান্য উপকরণ লাগে সকলে মিলে নেচে গেয়ে উৎসব করার জন্য, অথচ কত খাটুনি দরকার হয় ওইটুকু প্রস্তুতির জন্যই !

শিকার করে এনেছে বনের একটা পশু, সেটাকে পোড়াবার আয়োজন চলছে। রত্নাকরের মাথায় ঝিলিক দিয়ে যায় যে এই অসভ্য মানুষগুলি জীবন্ত পশুকে কখনও আগুনে পোড়ায় না।

একটা নিশ্বাস ফেলে রত্নাকর বলে, বছর সাতেক ঘুরে ঘুরে কাটল, কত জ্ঞানী কত মহাপুরুষের সঙ্গে মিললাম মিশলাম। কত দেখলাম কত শুনলাম কত জানলাম কত বুঝলাম। একটা সোজা প্রশ্নের জবাব পেলাম না, সত্যি কি আমি খুনী ? কিংবা আমাকে খুনে বানানো হয়েছে—আমার কোনো দোষ নেই ? ও অবস্থায় সুধা আর গোলোককে খুন না করে আমার উপায় ছিল না ? আগে বরং তেজের সঙ্গে ভাবতে পারতাম, বেশ করেছি, এমন বজ্জাত যে মেয়ে আর যার সঙ্গে তার এমন বজ্জাতি, দুজনকে খুন করাই ছিল আমার মহান কর্তব্য। একটু খামখেয়ালি ছিলাম, পড়াশোনায় যত পারা যায় ফাঁকি দিতাম—ওই মেয়েটার জন্য নিজেকে কলেজে পড়ার বিশ্রী কাজে জেল খাটার মতো উঠে পড়ে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। পাস করে চাকরি না পেলে ওকে পাওয়ার আশাও যে নিমাই—সেটা তো টের পেয়েছিলাম।

রত্না একটু থামে। জগদীশ কথা কয় না।

দিবারাত্রি খেটে পাস করলাম, পাস করে যাতে চাকরি বাগাতে পারি সেজন্য মাঝে মাঝে বড়ো চাকরে একজন আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে মান-অপমান তুচ্ছ করে তার পা চাটতে লাগলাম,—সে কথা ভাবলে আজও বুক ফেটে যায়। মাঝে মাঝে মাথায় ঝিলিক খেয়ে যেত—একটা মেয়ের জন্য কুকুর হলাম ? জগদীশ একদম চুপ করে থাকে। রত্নাকরের দম নেবার অবসরে ঝাল মিষ্টি টক কোনো রকম কথা বলে নিজেকে জাহির করে না।

এ তো ছা-পোষা প্রবোধ নয় যে বুঝে শুনে ধমক দিলেই উলটো সুর গাইবে !

বলতে বলতে মেতে গেছে। আবোল-তাবোল উলটো-পালটা যা খুশি বলুক, সব তাকে শুনতে হবে !

সেও নেশার ঝোঁকে কত আবোল-তাবোল বকে।

নেশা না করেও এক চুমুকে খেয়েই রত্নাকর এমন মেতে গিয়ে বলতে শুরু করলে তাকে বলতে দিতে হবে বইকী, মন দিয়ে শুনতে হবে বইকী তার কথা।

## অষ্টম অধ্যায়

দিনের হিসাব চব্বিশ ঘণ্টা।

তার মধ্যে সাত-আটঘণ্টা সে স্রেফ ফাঁকি দেয়, কড়া বিষাক্ত নেশায় মজে থেকে।

সত্যই কি ফাঁকি দেয় ?

চিত্রাতে এসে সমাপ্তি হল মদ আর মেয়ে নিয়ে তার বিকারের চরম ধিক্কারময় যৌবনের।

সে বিকার কি উত্তরাধিকার ?

সে বিকার কি জন্মগত না নিজের অর্জন করা ?

প্রথম শীতের বাতাস বইছে। মাঠ-বনের চেহারা বদলের সঙ্গে বাতাসে নতুন একটা জীবন্ময় গন্ধ মিশেছে।

আজকাল মাঝে মাঝে দিনের বেলাতেও জগদীশের মধ্যে মরিয়া ভাব জাগে। একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলার প্রচণ্ড ঝোঁক চাপে। রাত্রে নেশা চড়িয়ে সে মরিয়া হয় রোজ—তাকে অনায়াসে সামলে দেয় তাপ্পি আর জিরাইয়া, পায়ে ধরে আরেক চুমুক নেশা গিলিয়ে তার মরিয়া হবার ঝোঁকটাকে ঝিমিয়ে শান্ত করে ঘুম পাড়িয়ে দেয় সে রাতেব মতো।

জগদীশকে আজকাল দিবারাত্রি চিন্তা করতে হয়।

তার জীবনটা কেন এমন বিশ্রী হয়েছিল, কেন আবার শুকনো গাছের ডালপালায় সরস সতেজ হয়ে উঠে নতুন পাতা গজানোর মতো সুশ্রী হয়ে উঠছে জীবনটা ?

কেন শহর আর গ্রামের এত লোক জীবনটা সুশ্রী করার জন্য তার কাছে হত্যা দেয় ?

জীবন তো তবে বিশ্রী হতে পারে না !

অসুখ-বিসুখ ডাক্তার কবিরাজ হাসপাতাল নার্সিংহোম রাঁচি শহরে চেঞ্জে আসা তো আসল জীবন নয়।

চিত্রা জীবনকে অমান্য করে তাকে বশ করতে চেয়েছিল।

জীবনকে অমান্য করে সে চেয়েছিল চিত্রাকে বশ করতে।

একটা ছেলে, একটা মেয়ে। পবস্পরকে বশ করার জন্য তারা পাগল।

এ ব্যাপার তুচ্ছ নয় জগৎ-সংসারের হিসাবি মানুষদের কাছে। মেয়ে যদি ছেলেকে না চায় আর ছেলে যদি মেয়েকে না চায় তবে তো ফুরিয়েই গেল জীবনের কারবার !

বাপে-মায়ে এক রকম পিরিত হয়েছিল, পিরিত হয়েছিল ঠাকুর্দা-ঠাকুমায়। সে পিরিত ভালো লাগেনি, ভালো লেগেছিল লিওনরার তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রেম আর আত্মরক্ষার দুর্গ গড়া।

লিওনরার প্রশ্নটা নানাভাবে নানারূপে এলেও প্রশ্নটা ছিল একই ; তুমি কি পারবে আমার বাকি জীবনটার দায় বইতে ? তোমার মতো পয়সাওলা এ দেশের কোনো জোয়ান আমার দায় ঘাড়ে নিয়ে আমার সাথে পিরিত করতে চাইছে না—তাদের সে ক্ষমতা নেই। তুমি পারবে কি বিলাতি বউকে সারাজীবন সামলাতে ?

সুদর্শনা আর রত্নাকরের মধ্যে তর্ক যুদ্ধ রাগারাগি, মান-অভিমান লক্ষ করতে করতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল জগদীশ।

তার কেবলি মনে হচ্ছিল চিত্রার সঙ্গে এই রকম ছ্যাবলামি করতে গিয়ে সে চিত্রার এবং তার নিজের জীবনটা কীভাবে শেষ করে দিয়েছে, মহাপুরুষ তাকে পুরোধা রেখে ওরাও সেই একই বিরোধ সৃষ্টি করছে নিজেদের মধ্যে।

প্রপাতে ঢলে না পড়ে সুদর্শনা ঢলে পড়বে অকাম্য অসহনীয় জীবনে।

প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত করার মোহে রত্নাকর আত্মবিসর্জন দেবে সুদর্শনার আত্মীয়বন্ধু বর্জন করা সাংঘাতিক ব্যক্তিগত বিদ্রোহাত্মক জীবনের দায় নেবার বিপদ ঘাড়ে নিয়ে।

এদিকে আরও ছড়িয়ে পড়েছে উপজাতীয়দের বিদ্রোহের আগুন। জগদীশের আশ্রমের আশেপাশের গাঁয়েও এসে গেছে। জিরাই-তাপ্পিদের কাছে জগদীশ ব্যাপার শোনে, বিবরণ শোনে।

রত্নাকবের কাছেও শোনে।

আশ্রমে আর যেন মন টিঁকছে না রত্নাকরের, সারাদিন চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।

সুদর্শনা এসে ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যায়।

বারবার ফিরে যায়, তবু আবার আসে !

সাবাদিন টোটো করে ঘুরে রত্নাকর সন্ধ্যার সময় আশ্রমে ফেরে শুনে সেদিন তো সে একেবারে সন্ধ্যার সময় এসে হাজির তরুণের সঙ্গে—তার মারাত্মক স্পিডে গাড়ি চালানোর ঝোঁককে গ্রাহ্য না করে !

আজ ঠিক যেন তর্কযুদ্ধ হয় না তাদের মধ্যে, ঘরোয়া ধরনের একটা বচসাই যেন হয়ে যায় ! এবং দুজনকেই যেন রেগে আগুন হয়ে একটু পাশ ফিরে ঘুরে বসে জগদীশের দিকে চেয়ে গুম খেয়ে বসে থাকে।

তরুণ কোথায় যেন আদিবাসীর কুঁড়েতে কাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তার আগামী কবিতার মালমশলা সংগ্রহ করছে কে জানে, জগদীশের সঙ্গে খাতির জমাবার কোনো চেষ্টাই সে করে না। ঝোঁকেব মাথায় একদিন কবিতার বইটা উপহার দিয়ে প্রণাম করেছিল। তারপর একবার জিজ্ঞাসাও কবেনি কবিতাগুলি কেমন লেগেছে !

জগদীশ বলে, রতন, তুমি বাইবে গিয়ে বোসো, সোনার সঙ্গে আমার গোপন কথা আছে।

রত্নাকর নীরবে বেরিয়ে যায়। সুদর্শনা নড়েচড়ে মাথা হেঁট করে বসে থাকে।

জগদীশ বলে, সোনা, জানো তো আমার এখানে কোনো গোপনতা নেই ? রতনকে বললাম বটে তোমার সঙ্গে গোপন কথা আছে কিন্তু ওটা শুধু কথা বলার কায়দা। রতন বুঝে গেছে তোমার সঙ্গে আমি কী বিষয়ে কথা বলব।

সুদর্শনা নিশ্বাস ফেলে বলে, গোপন তো আমিও কিছু করিনি। এমন আবোল-তাবোল আসি, এ রকম ঝগড়া করি, আমি কী জানিনে আপনি সব জানতে বুঝতে পারছেন !

না গো মেয়ে, আমায় সবজান্তা ভেবো না। ললিতার ব্যাপারটা জানো ?

শুনেছি।

ললিতা ভেবেছিল, নেশার ঝোঁকে বুঝি মাথা বিগড়ে গেছে, তাই বলেছিলাম ওকে আমি পরীক্ষা করব। নেশা বইকী নিশ্চয় নেশা। এমনিতে আমার কোনো গোপনতা নেই—কিন্তু নেশা করে সেটা চরমে না উঠলে আমিই কি অতখানি সরল হতে পারতাম ? এমনিতেই আমার লজ্জাঘেন্না ভয়-টয় সব মিলিয়ে গেছে। আমি পাগলের মতো এমন অনেক কিছু করতে পারি তোমরা যাতে লজ্জা পাবে বিব্রত হবে বিপাকে পড়বে, আমার এতটুকু অস্বস্তিবোধ হবে না। কিন্তু কোনোদিন আমি তা করিনি কেন, কোনোদিন করব না কেন জানো ? আমার সব লজ্জা ঘৃণা কাম-টাম পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে, তোমাদের বিব্রত করার অধিকার তো আমার জন্মায়নি ! তোমরা এসেছ একটু স্বস্তি চাইতে, আমি সত্যি তো পাগল নই যে কোমরে এক টুকরো কিছু জড়াবার আলসেমিতে তোমাদের অস্বস্তি ভোগ করাব !

সুদর্শনা মুখ তোলে।

ললিতার কাছে শুনে কিছুই বুঝিনি। ওভাবে কেন এসেছিল, ওর রোগটা কী, কেন আপনি ওকে পরীক্ষা করতে চাইলেন—সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলে আবোল-তাবোল কথা বলে। ব্যাপারটা কী সোজাসুজি বলবে না কিছুতেই। আলোকবাবু যেদিন এলেন সেইদিন ডিনারে বসে তুচ্ছ কথা নিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে কী কাণ্ডটাই যে করল ললিতাদি। ঠিক যেন পাগল হয়ে গেছে। তারপর ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল না কী করল কে জানে, আমরা কত ডাকাডাকি করলাম—সাড়াও দিল না, শব্দও করল না। আলোকবাবু বাইরের ঘরে রাত কাটালেন।

জগদীশের মুখে মুচকি হাসি দেখে তার বর্ণিতা ললিতার মতোই যেন পাগল হয়ে গিয়ে চিৎকার করে সুদর্শনা বলে, হাসছেন ? অনেকে বলছে আপনিই মাথা বিগড়ে দিয়েছেন ললিতাদির—কোনো একটা মতলব নিয়ে কোনো একটা প্রক্রিয়া খাটিয়ে কিছু করেছেন।

জগদীশ কিছুমাত্র বিচলিত হয় না।

সে তো বলবেই পাঁচজন। নিন্দা ছাড়া প্রশংসা হয় ? ঘৃণা ছাড়া প্রেম হয় ? বেদনা ছাড়া, ব্যাধি ছাড়া আনন্দ হয় স্বাস্থ্য হয় ? একটা আছে বলেই আরেকটা আছে। পরীক্ষা করতে চাইলাম বলেই ললিতা ভড়কে গেল, নইলে আমি বলে দিতে পারতাম কীভাবে রেহাই পাবে। দেহের রোগ, দেহে প্রাকৃতিক একটা গোলমাল, ডাক্তারকে দেহটা পরীক্ষা করতে না দিলে কী করে ডাক্তার সে রোগ সারাবে ?

সুদর্শনা যেন কোনো মহাসত্যের সন্ধান পেয়ে আত্মসমাহিতা হয়ে গেছে এমনভাবে বলে, দেহের বোগ ? ললিতাদির দেহের রোগ ? ওব দেহে তো কোনো রোগ নেই, খুঁত নেই। ও নিজে বলে খুঁত আছে, ডাক্তার কোনো খুঁত খুঁজে পাযনি। আলোকবাবু তো ঠিক করেছেন দু-চারহাজার খরচ করে স্পেশালিস্ট দিয়ে ললিতাদি মানসিক রোগের চিকিৎসা করাবেন।

জগদীশ কোনো ইঙ্গিত করেনি, নিজে থেকে তাপ্পি ঘরে এসে তাকে বিলাতি বোতল থেকে আন্দাজ করে খানিকটা জল মিশিয়ে জগদীশের হাতে তুলে দিয়ে সরে যায়।

জগদীশ টের পায, তাপ্পির ভয় হয়েছে !

বিলাতি মাল না টেনে জগদীশ হয়তো সামলাতে পারবে না সুদর্শনাকে।

গেলাসটা নামিয়ে রেখে জগদীশ বলে, মানসিক চিকিৎসা ? স্পেশালিস্ট দিয়ে ? শরীরের অসুখ মনের চিকিৎসায় সারানো ? তাই তো বলছিলাম, তুমিও যেন ললিতাদির দশা দেখে উলটো পথে চলার জিদ কোরো না।

আমার দাদা ডাক্তার। তিনিও ছিলেন ডিনারে। বাড়ি ফিরে বললেন, ললিতাদির হিস্টিরিয়াও জন্মায়নি, ললিতাদি পাগলও হয়ে যায়নি। আলোকবাবুর সঙ্গে একটা কিছু সাংঘাতিক গন্ডগোল হয়েছে। এতদিন পরে আলোকবাবু এলেন, সাত-আটশো টাকার উপহার দিযে এলেন, হিস্টিরিয়ার রোগীও অন্তত কয়েক দিন সুস্থ শান্ত হয়ে থাকত। দাদা বললেন, ললিতাদি মনে নিশ্চয় ছেলেবেলা থেকে কোনো কমপ্লেকস ছিল—

তোমার ডাক্তার দাদা যাই বলে থাক, তোমার ললিতাদির মন ঠিক আছে। দেহ নিয়ে এত করেও মনটা ঠিক রেখেছে, এমন মা কি সহজে মেলে ? তোমার ডাক্তার দাদার মাথায় গোবর, মিস্টার আলোকবাবুর মাথায় গোবর, ললিতা.. মাথাতেও গোবর—তাই তো এমন ভূতুড়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। ভূতে পেয়েছে হলুদপোড়া দিয়ে সারাও !

সুদর্শনা চুপ করে থাকে। ললিতাদির কী হয়েছে না হয়েছে সে জানে না, স্পেশালিস্ট ডাক্তাররাও বোধ হয় জানে না।

নইলে ললিতা সারাদিন সকলের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে অনেকটা মিলেমিশে, মিলিয়ে মিলিয়ে প্রতাপের টাকাপয়সার হিসাবনিকাশ দেখে শুনে বেশ কাটিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা হলেই তার মাথা যায় বিগড়ে। যেমন-তেমন যে কোনো রকম একটা ছুতো ধরে আলোকেব সঙ্গে ঝগড়া করে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়।

ঘুমোয় না।

অনেক রাত অবধি সে যে ঘুমায় না সেটা টের পায় সকলেই।

জেগে থাকে কিন্তু ডাকলে সাড়া দেয় না।

সুদর্শনা আনমনা হয়ে গিয়েছিল। নিজের ব্যাপারটা ভুলে গিয়ে মশগুল হয়ে গিয়েছিল ললিতার রহস্যময় সমস্যার চিন্তায়।

তাপ্পি আবার মহুয়া মেশানো মদ আনে।

জগদীশ পান করে না, সামনে রাখে।

আমার দোষ নেই কিন্তু। আমি তোমার সমস্যাটা নিয়েই শুরু করেছিলাম। তুমিই তোমার ললিতাদির সমস্যা নিয়ে বিভোর হয়ে ওইদিকেই চলতে লাগলে, নিজেকে ভুলে গেলে। অন্যের কথা ভেবে নিজেকে ভুলতে পারো বলেই তোমাকে কিন্তু আমি এত ভালোবাসি মেয়ে !

সুদর্শনা কাতবভাবে বলে, কিন্তু আমার এ বকম হল কেন ? সবাই বলাবলি করছে, আমার মাথা বিগড়ে গেছে। একটা আধ-পাগলা ভবঘুরে ভিখারি—

জগদীশ বলে, তোমাদেরই এ রকম হয়। বড়ো বড়ো কথা ভাববে, বড়ো বড়ো আদর্শ আঁচাবে, কাজে কিছু করবে না। কীভাবে বাঁচা উচিত জানবে এক বকম, জীবনটা করবে অন্য রকম।

সব তালগোল পাকিয়ে যাবে না ?

## নবম অধ্যায়

জলধি রায়েবও পদার্পণ ঘটে জগদীশের আশ্রমে।

প্রবোধকে খুঁজে পেতে সঙ্গে নিয়ে আসে। বলে, একটা গুজব শুনলাম। আরও শুনলাম, আপনার বন্ধু প্রবোধবাবুই নাকি গুজবটা ছড়াচ্ছেন। ওনাকে সঙ্গে নিয়েই দেখতে এলাম ব্যাপারটা কী।

সকলকে তুমি বলা অভ্যাস হযে গেছে। এই সেদিনও জলধিকে মিস্টার রায় বলে সম্বোধন করেছে, আপনি বলে কথা বলেছে, সে সব যেন খেয়ালও নেই জগদীশের। চুল পাকা ভুরুপাকা অজানা অচেনা প্রতাপ এসেই পায়েব তলায় লুটিয়ে পড়েছিল, শিশুর মতো কাতরভাবে ভক্তিগদগদকণ্ঠে বাবা বলে ডেকেছিল, তাকে তুমি না বলে উপায় থাকেনি।

জগদীশের এটাও খেয়াল থাকে না যে জলধি ভক্ত বা শিষ্য হিসাবে তার কাছে আসেনি।

সাধুবাবার কাছে সে আসেনি। এসেছে জগদীশের কাছে। আগের পরিচয়ের জের টানতে এসেছে।

কেন এসেছে সেটা অবশ্য হঠাৎ বোঝা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বোঝা যায় যে তার শুধু নিছক কৌতূহল নয। কিন্তু প্রবোধকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

শুধু অভ্যাসের বশে যান্ত্রিকভাবে নয়, হাসিমুখে আন্তরিকতার সঙ্গেই বলে, জলধি এসেছ ? বোসো। অন্য কেউ হলে নিয়ম ভাঙার জন্য দূব দূর কবে তাড়িয়ে দিতাম। সন্ধ্যার পর আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না। প্রবোধকে সঙ্গে নিয়ে তুমি এসেছ, তোমাদের বেলা আইন ভাঙতেই হবে।

প্রবোধ বোসো।

জলধি বসেও না, কথাও বলে না। তার মুখের ভাব দেখে জগদীশ আমোদ পায়। জলধি চটেছে। ভীষণ চটেছে। তাকে জগদীশ বাপের মতো, মহাপুরুষ সাধুর মতো, এ রকম সহজ অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনা জানাবে এটা সে কল্পনাও করতে পারেনি। তাকে খানিকটা ধাতস্থ করার জন্য জগদীশ খানিকটা হালকা ইয়ার্কির সুরে ব'ল, আরে বাবা বোসোই না ! অ্যাদ্দিন পবে দেখা হল, ভদ্রতা করা দিয়ে শুরু করলে আজ শুধু ভদ্রতাই করা হবে। বোসো, বন্ধুব মতো আলাপ শুরু করে দাও। মিস্টার-ফিস্টার, আপনি-টাপনির ভজকট জুড়ো না। ইচ্ছা হলে তুই-তোকাবি চালিয়ে যাও।

প্রবোধের শঙ্কিত ভাব দেখে জগদীশ মনে মনে আরও আমোদ পায়।

জলধি ধীরে ধীরে বসে। চারিদিকে চোখ বুলায। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জগদীশকে দ্যাখে। তারপর খানিকটা সহজ সুরে বলে, শেষকালে এইখানে এসে সাধু সেজেছেন ? ব্যাপারটা কী ?

জগদীশ বলে, সেই চিরকেলে ব্যাপার। মানুষকে ছাড়লাম, সভ্যতা ভুললাম—কমলি কিন্তু আমায় ছাড়ছে না ! এখানে ধাওয়া করে এসে পাকড়াও করেছে।

জলধি আশ্চর্য হয়ে বলে, এই সোজা কথাটা জানতেন না ? অসভ্য জংলিদের বাদ দিয়ে কি মানুষের সভ্যতা ? ওরা দলে দলে না খেয়ে শুকিয়ে মরেছে বলেই তো সভ্যতা আকাশে উড়তে শিখেছে।

মানুষকে আকাশে ওড়াতে সভ্য মানুষও প্রাণ দিয়েছে—অনেকে দিয়েছে। সভ্যতা-অসভ্যতার বিচারটা আমরা গ্রাম আর শহরের মাপকাঠিতে করি কি না- –তাই ভুল হয়ে যায়। শহরের গুন্ডা কি গেঁয়ো বুনো মানুষেব চেয়ে সভ্য ? যুদ্ধ বাধিয়ে চারিদিকে সর্বনাশ ছড়িয়ে সভ্যতাকে দুর্বল করে যারা কুবেরের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়—তারা কি সভ্য ?

এতক্ষণ পিছনে দাঁড়িয়েছিল, এবার রত্নাকর সামনে এসে বসে। জিজ্ঞাসা করে, খবর কী জলধিবাবু ? কেমন আছেন ?

জীবনবাবু, আপনি এখানে ? আমার তো আশ্চর্য লাগছে !

কেন ? আপনি এসে জুটলেন সেটা আশ্চর্য নয়—আমি এলে সেটা খাপছাড়া হবে কেন ?

এঁর সঙ্গে আগে আমাদের জানা-চেনা ছিল। আপনি কি আগে এঁকে চিনতেন ? আপনাকে তো ওই সার্কেলে কখনও মিশতে দেখিনি !

রত্নাকর বলে, জানা-চেনাটা নতুন করে হয় না ? যাদের মধ্যে জানা-চেনা হয়েছে তাদের মধ্যেই সেটা চিরকাল সীমাবদ্ধ থাকে নাকি ? উনি কি আপনাদের আগেকার সেই উঁচু সার্কেলে রয়ে গেছেন—ওঁকে আজ আবার নতুন করে আমাদের সার্কেলটা জানতে চিনতে হচ্ছে না ?

জগদীশ হেসে বলে, অন্যায় অনুযোগ করছ রত্নাকর। পাঁচ বছরের ছেলেকে ছেড়ে বাপ যদি বিদেশে যায় বিশ বছরের জন্য—বাড়ি ফিরে সে কি চিনতে পারবে ছেলেকে ? একটা একদম অজানা নওজোয়ানের সঙ্গে নতুন করে জানা-চেনা করতে হলে সেটা কি দোষের কথা হবে ? জলধি এসেছে আমার সঙ্গে আগের পরিচয়ের সূত্র ধরে, তোমার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেছে—কিন্তু আমাকেও চিনতে পারছে না তোমাকেও চিনতে পারছে না। অনুদার হয়ো না রত্নাকর, ওকে একটু সমঝে নেবার সময় দাও।

প্রবোধ হাঁ করে চেয়ে থাকে। তার সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে।

বোঝা যায় অসীম বিস্ময়ের সঙ্গে সে ভাবছে, এই কি সেই জগদীশ ? সেই অস্থির চঞ্চল ভাবোন্মাদ খামখেয়ালি একগুয়ে উচ্ছৃঙ্খল জগদীশ ?

এ জগদীশ যে কথা কইছে দিব্যদর্শী ঋষির মতো।

এমন বোগা হয়ে গেছিস ?

জগদীশের সহজ সাদামাটা ঘরোয়া প্রশ্ন শুনে চমকে উঠে প্রবোধ বড়ো লজ্জা পায়। লজ্জাটা সামলে নিতে তার খানিকটা সময় লাগে।

বড়ো ঝঞ্ঝাট সংসারে, না ?

জগদীশ হাসিমুখে পুরানো দিনের বন্ধুর মতো অন্তরঙ্গভাবে এ প্রশ্ন করতে প্রবোধ রেগে যায়।

সাধু হয়ে কী এমন মোটাসোটা হয়েছিস তুই ? সংসারে ঝঞ্ঝাট আছে, তোর সাধুগিরিতে বুঝি ঝঞ্ঝাট নেই ?

চটিস কেন ভাই ? আমি কি তোর সত্যিকারের সে রকম সাধু ? সাধু হবার কোনো সাধ নিয়ে এখানে ডেরা বেঁধেছিলাম ? দশজনে গায়ের জোরে আমায় সাধু বানিয়েছে—কত বকি-ঝকি তবু শুনবে না। ঝঞ্ঝাট বইকী—বিষম ঝঞ্ঝাট। এই শণের কুঁড়েতে মদ খাওয়ার চেয়ে কলকাতা প্যারি লন্ডনের হোটেলে মদ খাওয়া ঢের সহজ।

কথাবার্তা বলে তর্কবিতর্ক চালিয়ে হারিয়ে যাওয়া পরিচয়কে খানিকটা নতুনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা জলধির কিন্তু একেবারেই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে ছাড়া-ছাড়াভাবে দু-একটা কথা বলে—তাও আবার হয় খোঁচা দেওয়া ব্যঙ্গ করা কথা !—তার মনের জ্বালার ঝালটা বেশ টের পাওয়া যায়। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে জগদীশকে লক্ষ করে, তার কথা শোনে।

হঠাৎ ঝিলিক মারার মতোই তার দৃষ্টি শাণিত হয়ে ওঠে।

জগদীশ একসময় সহজভাবেই বলে, কত লোকেই তো সাধু সেজে মানুষ ঠকাচ্ছে—আমি ঠকাচ্ছি বলেই এত রাগ কি করতে আছে জলধি ? রাগের জ্বালায় তোমার নিজের কষ্টই বাড়ছে !

জলধি রূঢ়ভাবে বলে, আমি কি শিশু যে আপনি সাধু সেজেছেন বলে রাগ করব ? কিন্তু আমি আপনার শিষ্যও নই, ভক্তও নই—আমায় দয়া করে তুমি বলবেন না !

জগদীশ হেসে বলে, সবাইকে আমি তুমি বলি, আপনি বলা আসে না। তুমিও আমায় তুমি বলো না, চুকে যাক। রত্নাকর গোড়ায় আপনি বলত, তারপর তুমিত্বে পৌঁছে গেছে। ক-দিন পরে হয়তো তুই-তোকারি শুরু করবে।

জলধি বলে, ও সব ন্যাকামি আমার আসে না।

আসবে—যাতায়াত করতে করতে আপনা থেকেই আসবে।

সেদিন রাতে আবার জলধি আসে।

তারই ইঙ্গিতে চারজন মানুষ এসে নীরবে জগদীশের কুঁড়েঘরের দাওয়ার সামনে দাঁড়ায়, তাদের তিনজনের হাতে রাইফেল, একজনের হাতে রিভলবার।

গায়ে যেন জোর পায় জলধি।

কে জানে জগদীশের মেজাজটা সে রাত্রে আগে থেকেই ভালো ছিল কিনা অথবা জলধির কাণ্ড দেখে তার মেজাজ ভালো হয়ে যায় !

একেবারে ফৌজ নিয়ে হাজির ? তুমি বলায় এত রাগ হয়েছে জলধি ?

আপনার এই কেন্দ্রটা খুলবাব পর বড়ো বেশি চুরি চামারি হচ্ছে চারদিকে। আপনার দোহাই দিয়ে চোরেরা রেহাই পাবার চেষ্টা করছে। আপনার আশ্রমের নামে ভিজিটরদের ভয় দেখিয়ে টাকা পয়সা আদায় করছে। এ সবের পিছনে আপনি আছেন, আপনিই সবকিছুর জন্য দায়ি। দুঃখের কথা হল, কিন্তু কী করব, আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করতে এসেছি।

গ্রেপ্তার করো।

তাহলে দয়া করে আমার সঙ্গে চলুন।

আবলুশ কুঁদে তৈরি করা শ-তিনেক মেয়ে-পুরুষ আঁধার ফুঁড়ে জড়ো হয় কুটিরেব সামনে।

অস্ত্রধারী চারজনকে তিন দিকে ঘেরাও করে জমাট বাঁধে।

কারও হাতে কোনো অস্ত্র নেই। যে সব আদিম অস্ত্র সম্বল করে তারা বাঘ-ভালুকের রাজত্বে শিকার করতে যায়, সে অস্ত্রগুলি পর্যন্ত সঙ্গে আনেনি।

জলধি একবার গলা খাঁকারি দেয়।

জগদীশ হেসে বলে, প্ল্যান ঠিক করাই ছিল ? কিন্তু এ প্ল্যানে কি সামলাতে পাববে ? তিন-চারশো লোক মরিয়া হয়ে হঠাৎ ঘিরে ধরলে চারটে রাইফেল কী করতে পারে ?

বাগে পেয়ে চুকলি শোনাচ্ছেন ?

খুব নমিত শান্ত মনে হয় জলধির প্রতিবাদ।

বাগে পেয়েছি নাকি তোমাকে ? আমার তো জানাও ছিল না তুমি হঠাৎ এভাবে আসবে। ওরা আমার কথায় ওঠে-বসে। আমাকে জিজ্ঞাসা না করে তোমায় ছিঁড়ে খাবে না, ভয় নেই। ওরা কেন আমায় এত ভালোবাসে জানলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

বলুন না শুনি।

তোমার সাহস আছে। কী করে ল্যাজ গুটিয়ে পালাবে ভাবছ অথচ দেখাচ্ছ যেন আমার কথা শোনার জন্য তোমার আগ্রহের অন্ত নেই। একটা পেগ চলবে ? সেরা স্কচ।

জলধি হাতের তালুতে তালুতে ঘসে ঠিক যেন জ্বালা ও আপশোশের ফেনা তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে বলে, না।

আড়চোখে সে চেয়ে দ্যাখে, তার জবাব যেন শুনতেই পায়নি এমনিভাবে জগদীশ দামি বিলাতি বোতলের মদ স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে ঢেলে তার সামনে এগিয়ে দেয়।

বলে, বোসো না আমার ঘরে। আতিথ্য গ্রহণ না করে আমাকে অপমান করতে পারো—কিন্তু তোমাকে ও রকম ছেলেমানুষ ভাবতে পারছি না।

এক গেলাস জলও জগদীশ গড়িয়ে দেয়।

জলধি হাসবার চেষ্টা করে বলে, জল ভালো তো ? কলেরা হবে না তো ?

ঝরনার জল। প্রপাত থেকে আনা।

যাকগে। আপনি তো আর সাধাবণ মানুষ নন, ছোটোলোকের মতো প্রতিহিংসা আপনি নেবেন না। কিন্তু এইটুকু খেয়ে কি পোষাবে ?

একান্ত অবহেলার সঙ্গে দামি বিলাতি মদের বোতলটা এগিয়ে দিয়ে জগদীশ বলে, ভয় পেয়ো না। কুঁড়েঘরে থাকলেও আমি আতিথ্য জানি। উনিশ-বিশ বছর বয়েস থেকে জানি এক চুমুকের মদ কাউকে অফার করা অসভ্যতা, খেতে না পেয়ে যে মরে যাচ্ছে তাকে দু-চামচ দুধ খেতে দেওয়ার মতো ছোটোলোকামি।

বোতল কাত করে আরও খানিকটা মদ গেলাসে ঢেলে অল্প একটু জল মিশিয়ে কী বকম তৃষার্তের মতো জলধি গেলাসের শেষটা শুষে নেয় দেখে জগদীশ মমতাবোধ করে।

প্ল্যান ফসকে বিপাকে পড়াব রাগে ভয়ে-অপমানে তার গলা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে বুঝতে কষ্ট হয় না।

সিপাই নিয়ে জলধির আকস্মিক আবির্ভাব আবও রহস্যময় হয়ে ওঠে ললিতা ও সুদর্শনার আবির্ভাবে।

ক্রোধে সুদর্শনাব মুখে গাম্ভীর্যের অপূর্ব ব্যঞ্জনা ফুটেছে। রাগে তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল।

আমাদের গালে চুনকালিও দিলেন, আমাদেব বিপদেও ফেললেন। আপনি কেমন মানুষ জলধিবাবু ?

জলধি তখন আকাশ ছাড়িয়েও অনেক উঁচুতে চড়েছে। নিয়মিত নয়, অভ্যস্ত তার নয়, তাই বেশি মাত্রা দবকার হয় না।

প্রথমে হাতজোড় করে। তারপর হাসে। তারপর বিকৃত মুখভঙ্গির সঙ্গে সুদর্শনাকে স্যালুট করে। তাবপর আবার হাসে।

কেন ? কী করেছি ? পুবানো বন্ধু, মহাপুরুষ—একবার দেখা করতে এলাম।

সুদর্শনা গর্জন করে ওঠে, পুবানো বন্ধুব সঙ্গে দেখা করতে আসতে আপনাব চারজন আর্মড গার্ড লাগে ? বাবাকে কী বলে ভুলিযেছেন আমি জানি না ভেবেছেন ? বাবাও অস্বস্তিবোধ করেছিলেন—হুকুম নিয়ে এসেছেন, উপায় নেই, নইলে বাবা গাড়িও দিতে না, গার্ডও দিতেন না। বাবাব রকম দেখেই আমার সন্দেহ হল—আপনিও বাড়ি নেই। জিজ্ঞাসা করতে বাবা যা বললেন শুনেই বুঝতে পারলাম একটা মতলব নিয়ে এসেছেন। ছিছি !

জগদীশ হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, বাবা কী বললেন ? বাবার মুখে কী শুনে ব্যাপার অনুমান করে তুমি আমার নতুন মা-কে সাথে নিয়ে আমায বাঁচাতে ছুটে এলে ?

ললিতা ও সুদর্শনা একবার চোখে চোখে তাকিয়ে নেয।

জগদীশের জিজ্ঞাসায় জবাব দেয় সুদর্শনার বদলে ললিতা।

বুনোরা হাঙ্গামা করছে জানেন তো ? জলধিবাবু ব্যাপারটা বুঝতে এসেছেন। কিছুই করবেন না, শুধু আন-অফিসিয়ালি ব্যাপারটা দেখে শুনে বুঝে গিয়ে একটা রিপোর্ট দেবেন। উনি যাতে বিপদে না পড়েন সে জন্য অর্ডার আছে যে উনি চাইলেই আর্মড গার্ড দিতে হবে। আজ দুপুরে আমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন ছিল—আজ বাবার জন্মদিন। জলধিবাবু প্রথম থেকেই—ললিতা একটু হাসে।

জলধির ঢুলুঢুলু ভাব দেখে মনে হয় না সে কোনো কথা শুনছে বা বুঝছে।

তার দিকে চেয়ে সংকোচ জয় করে ললিতা বলে যায়, প্রথম থেকেই খালি চিত্রাদির কথা বলতে লাগলেন। কী সব বিশ্রী কথা, চিত্রাদিকে নাকি খুন করা হয়েছে—

জলধি জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, নিশ্চয় খুন করা হয়েছে !

এই গুন্ডাটা খুন করেছে।

ভোররাতে জগদীশের ঘুম ভেঙ্গে যায় !

দিনে প্রবোধ আর জলধি এসেছিল বলে নয়। রাতের নাটকীয় কাণ্ডটার জন্যও নয়। প্রাণে নতুন একটা জিজ্ঞাসা জেগেছিল বলে সে নেশাকে খাতির করেনি।

নেশা আর অভ্যাসের পার্থক্য কতখানি সেটা তো আর তার অজানা নেই।

পেটের গোলমালের জন্য সুদর্শনার মা ছাড়াও তার কয়েকজন ভক্ত নিয়মিত আফিং খায়—কেউ খায় তিল পরিমাণে, কেউ খায় বেশি।

কেউ ওষুধের মতো নিয়মিত আফিং খেলেই তার দুধ খাওয়ার অধিকারটা সংসারে স্বীকৃত হয়।

শিশুদের দুধে সে ভাগ বসালেও তার অপরাধ হয় না। তাই একই ওষুধ খেলেও ওদের মধ্যে কারও বেলা সেটা হয় অভ্যাস, কারও বেলা হয় নেশা।

শেষরাত্রের আবছাওয়া আলো-অন্ধকারে প্রপাতের দিকে চলতে আরম্ভ করেই জগদীশ টের পায় যে ভক্তদের পাহারায় ঢিল পড়েছে।

কয়েক মাস ধরে দিনেরাত্রে যে কোনো সময়ে প্রপাতের দিকে যাওয়া বন্ধ করেছিল বলে ওদের সতর্ক দৃষ্টিতে একটু শিথিলতা এসে গেছে।

আমোদ বোধ করছে জেনেও বুকটা টনটনিয়ে ওঠে জগদীশের। কী দিয়ে সে অর্জন করছে সকলের এই ভালোবাসা ? তাকে পাছে বনের বাঘে-ভালুকে সাবাড় করে সে জন্য এদের এত ভয়, এত সতর্কতা ?

## দশম অধ্যায়

জগদীশ জিজ্ঞাসা করে, শান্তি কি কিছুটা পাচ্ছ প্রতাপ ?

অশান্তির ঝাঁঝ কিছু কমেছে ?

প্রতাপ কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বলে, অনেক কমেছে বাবা। অশান্তির ঝাঁঝে চোখে অন্ধকার দেখেছিলাম। তোমার কৃপায় মতিগতি কত যে বদলে গেছে ছেলেমেয়ে বউমাদের।

জগদীশ হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, তোমার সোনার ছেলে আলোক আসে না কেন ?

কয়েক মিনিট মাথা হেঁট করে থাকে প্রতাপ।

ওর হল কাজের মানুষের মতিগতি। কাজের বিষয় ছাড়া কোনো কথা জানতে চায় না, বুঝতে চায় না। বলে কী, কাজ করার, কাজের চিন্তা করাব সময় পাই না, আমায় ও সবের মধ্যে টেনো না।

একটু থেমে মুখ তুলে খুশির সঙ্গে বলে, এবার দেখছি ভাব-সাব খানিকটা অন্য রকম। সব তোমাব দয়া বাবা—সাধে কি আমি তোমার চরণ সার করেছিলাম শেষবারের মতো। তুমি যদি না দয়া করতে বাবা, আমি ধর্মকর্ম সংসার ছেড়ে দিয়ে বুড়ো বয়সে বেশ্যাবাড়িতে গিয়ে ঠাঁই নিতাম—মদ-বেশ্যা সার কবে নরকে যেতাম।

পরম ভক্ত প্রতাপ তার কথা বলার ধাঁচ আযত্ত করেছে, মনের চিন্তা হৃদয়ের ভাব মিলিযে মিশিয়ে কথা বলার স্টাইল বেশ খানিকটা অনুকরণ করতে শিখেছে।

জগদীশ বলে, তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে ছলনা করেছিলে প্রতাপ। তোমার সোনার ছেলে আলোক আর ললিতার মধ্যে যে মিল নেই এটা গোপন করেছিলে।

হাত বাড়িযে জগদীশের পা ছুঁয়ে প্রতাপ বলে, বিশ্বাস করো বাবা, ছলনা করিনি। আমি কিছুই বুঝি না ওদেব ব্যাপাব। কী বলতে কী বলে ফেলব, উলটো কথা মিছে কথা বলে বসব —এই ভয়ে চুপ কবে থেকেছি। চিরকাল সংসারে দেখলাম মিল না থাকলে স্বামী-স্ত্রীতে নানারকম ঝগড়া হয়, অশান্তির সীমা থাকে না। কোনোদিন ওদেব মধ্যে মনোমালিন্যের চিহ্নটুকু দেখি না।

সোজা হযে বসো প্রতাপ। বারবাব পায়ে হাত দিয়ো না। অতিভক্তি যে চোবের লক্ষণ তা তো জানো ?

প্রতাপ আহত হয়ে সোজা হয়ে বসে। জগদীশ বলে, চোখ থাকতে অন্ধ, কী করে দেখবে পাবে সোনার ছেলে আর সোনার বউমার মধ্যে মনোমালিন্যের চিহ্ন ? তোমার সেবা করাব জন্য ললিতা স্বামীর কাছে না থেকে তোমার কাছে থাকে, তোমার বিষয়কর্ম ব্যাবসাযেব খুঁত ধরে লাভ বাড়ায়, কী করে তোমাব চোখে পড়বে ওদের মনোমালিন্য ?

ওদের মাঝে মাঝে দেখা তো হয় ? রাগ অভিমান কখনও দেখিনি। হাসিমুখে মিষ্টিসুরে কথা কয় —

জগদীশ প্রায় গর্জন করে ওঠে, প্রতাপ ! মনে আছে প্রথম দিন তোমায় বলেছিলাম, তোমার প্রণামি আমি নেব না, তোমার শান্তি জুটবে না ? মনে আছে, প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেছিলাম ? এই বুঝি তোমার প্রায়শ্চিত্ত করার নমুনা !

প্রতাপ কাতরভাবে বলে, যা বলছেন তাই তো শুনেছি—

কই শুনছো ? স্পষ্ট বলে দিলাম—লাভের টাকাকে ভগবান না করে মানুষকে এবার ভগবান করো। বড়ো স্কেলে না পারো, নিজের মস্ত সংসারটার মানুষগুলোকে অন্তত বড়ো ভাবো তোমার বিষয়-সম্পত্তি টাকা-পয়সার চেয়ে। শুনে তুমি ভড়কে গিয়েছিলে। ভেবেছিলে, আমি তোমার মধ্যে বৈরাগ্য জন্মিয়ে তোমায় সন্ন্যাসী করে দিতে চাই। মনে আছে বলেছিলাম, লাভের টাকার মায়া কাটিয়ে দিতে চাইলে তুমি ভড়কে যাবে ?

প্রতাপ নীবে চেয়ে থাকে।

মনোমালিন্য চোখে পড়েনি আদুরে ছেলে, আদুরে বউমার ? তোমার সোনার ছেলে ছুটি নিয়ে বাপের বাড়ি এলে তোমার সোনার বউমাটি যে নানা ছুতোয় দু-একদিনের মধ্যে বাপের বাড়ি পালায়—এটা তুমি খেয়াল করোনি বলতে চাও ?

প্রতাপ যেন খুশিতে ফেটে পড়ে ! বলে, মহাপাপী আমি, তাইতো ক-দিন ধরে ভাবছিলাম শেষ জীবনে মরার আগে শেষবারের মতো চরণ সার করলাম, তিনিও কি শেষ পর্যন্ত আমায় ঠকাবেন ? দিব্যদৃষ্টি আছে জেনে যাঁর কাছে এলাম, তাঁকেও জানাতে হবে সব খুঁটিনাটি বিবরণ, তবে তিনি আমার অশান্তি দূর করবেন !

মাথা হেঁট করে প্রতাপ দেশলাইয়ের পোড়া কাঠিটা দিয়ে গোবর-লেপা মেঝেতে খানিকক্ষণ আঁচড় কাটে ! তারপর ধীরে ধীরে হলেও জোরে সঙ্গে বলে, সব দেখেছি বাবা। এ তো কোনো সূক্ষ্ম-দর্শন নয় যে বোকাহাবা আমি মোটা চোখে দেখতে পাব না। আলোক ছুটি নিয়ে বাড়ি এলেই দু-চারদিনের মধ্যে বউমা ছুতো করে বাপের বাড়ি চলে যায়। একবার ছুতো হল তার বাপের অসুখ একবার তার দিদিমার শ্রাদ্ধ—

জগদীশ শান্তভাবে বলে, এই তো প্রায় বুঝে গিয়েছ ব্যাপারটা প্রতাপ। আরেকটু বুঝতে তোমার সাহস হয় না কেন ? ভয় পাও কেন ?

কিন্তু সব বার তো এ রকম করে না। যাব যাব বলে—কিন্তু নিজেই শেষ পর্যন্ত আর যায় না। বেশ হাসিখুশিভাবেই থাকে। তাইতো ঠিক বুঝি না বাপ।

তোমার ছেলের তো বোঝা উচিত ?

প্রতাপ চুপ করে থাকে।

মানুষ পাগলের মতো টাকা চায় কেন প্রতাপ ? বালিশের নীচে কোটি টাকার নোট রেখে, টাকা চিবিয়ে খেয়ে কি কোনো সুখ হয় মানুষের ? টাকা দিয়ে সুখ কিনতে হয় বলে বাঁকা মানুষের ধাবণা জন্মে গেছে, টাকাই বুঝি সুখ। দেখতে পাও না, কাটা ছাগলের মতো ছটফট করছে লাখ লাখ টাকার মালিক ? এমন নেশা টাকা রোজগারের যে তোমার সোনার ছেলে জানে না কিছু টাকা খরচ করে চিকিৎসা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, বউটাকে আর স্বামীর ভয়ে বাপের বাড়ি পালাতে হবে না। তোমার সেবার ছুতো ছেড়ে, তোমার ছেলের সঙ্গে গিয়ে তোমাকে দু-চারটে নাতি-নাতনি উপহার দিয়ে—

প্রতাপ গুম খেয়ে বসে থাকে ঘণ্টাখানেকেরও বেশি।

জগদীশ বলে, আলোককে পাঠিয়ে দিয়ো—ওর সঙ্গে কথা বলব।

কত মানুষ আসে যায়। কত কথা, কত আলোচনা হয়।

জগদীশকে কোনো কোনোদিন খুব বেশি রকম খুশি মনে হয়।

তাকে নিয়ে এমনভাবে পাগল হয়ে গেল মানুষেরা ? কোনোদিন আবার তার মুখ গম্ভীর হয়ে থাকে।

বুনো মানুষ, গরিব চাষি মানুষ, অশিক্ষিত দোকানি, কারবারি মানুষ, অল্পশিক্ষিত ধনী ব্যবসায়ী মানুষ, শিক্ষায় দীক্ষায় টাকায় পয়সায় বনেদি মানুষ, আপিসের কেরানি মানুষ, কারখানার মজুর মানুষ ?

ভেবে মাঝে মাঝে অহংকারে আকাশে উঠে যায় জগদীশের মন। মাঝে মাঝে আতঙ্কের নরকে নেমে গিয়ে আত্মগ্লানির আগুনে দগ্ধ হয়।

কী সে করেছে মানুষের জন্য ?

কিছুই করেনি।

অনেক মেয়ের সঙ্গে খেলা করে একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিল—নিজের দোষে তাকে হারিয়ে প্রাণের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে, নেশা করার বিষের আগুনে পুড়তে পুড়তে মরতে চাওয়ার কী অদ্ভুত পরিণাম এটা যে বিচিত্র বিচিত্র মহামানবতা তার কুঁড়েঘরের দরজায় এসে হানা দিয়ে দাবি জানায়—শান্তি দাও, জীবন দাও, বাঁচাও !

রত্নাকর, আমি কী করে মহাপুরুষ হলাম বলতে পার ?

ভালোবাসাকে তুলে ধরতে জীবন-যৌবন ধন-মান বিসর্জন দিয়েছ বলে। আখেরে লাভের আশায় ও সব ত্যাগ করোনি বলে। তুমি খাঁটি ত্যাগী বলে, আদর্শের জন্য ত্যাগ করেছ বলে। একজনকে যে এমনভাবে ভালোবাসতে পাবে, মানুষকেও সে কী রকম ভালোবাসতে পারে তুমি জানো না, তোমার বড়ো বেশি বিনয়।

ভালোবাসাব মানে জানো ? বুঝিয়ে দিতে পার ?

বুঝিয়ে দিতে পারব না। ভালোবাসা নিয়ে তুমি যে কাণ্ড জুড়েছ দাদা, আমরা বেশ কিছুটা ভড়কে গিয়েছি।

আমি তো মহাপুরুষ হবার কোনো চেষ্টা করিনি।

করোনি বলেই মহাপুরুষ হযেছ। জানাই তো আছে যে মহাপুরুষ হবার চেষ্টা করলে সব ভেস্তে যাবে। তাই মহাপুবুষ না হবার চেষ্টায় মহাপুরুষ হয়েছ।

তোর বাঁকা কথা আমি বুঝি না।

চেষ্টা না করেই বুঝবে, এমন কথা বলি নাকি ? বুঝবার চেষ্টাই করো না তা কী হবে ! শিষ্যের কথা গুরু বুঝবে না সেটা তো গুরুর সব চেয়ে বড়ো অপরাধ। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক থাকবে—শিষ্যের কথা গুরু বুঝবে না ! গুবুব তো সর্বনাশ হয়ে গেল। শিষ্য গুরু হয়ে গেল।

তোকে আবার শিষ্য করলাম কবে ?

তাপ্পি এসে খবর দিয়ে যায় আজ মহুয়া জুটবে না জগদীশের। বিলাতির সঙ্গে মহুয়া চালিয়ে বড়োই কাহিল হয়ে পড়েছে জগদীশ—তার শবীর ভেঙে পড়ছে।

যত বড়ো সাধু হোক, যত বড়ো যোগী হোক—বুনো মানুষ তাবা ঠিক করেছে আজ থেকে তাকে মহুযা দেওযা বন্ধ।

পরদিন প্রতাপ এসে অপরাধীর মতো বলে, আলোক বলল, নানাকাজে খুব ব্যস্ত—ক-দিন পরে সময় করে আসবে।

ছুটি নিয়ে এসেছে না ? তবু ব্যস্ত ?

প্রতাপ প্রায় কাতরভাবে বলে, ওব মন ও মেজাজটা একটু অন্য রকম বাবা।

জগদীশ হেসে বলে, বেশ তো। গবজ আমার, আমিই কাল গিয়ে তোমার ছেলের সঙ্গে দেখা করব। যত ব্যস্তই হোক, দুপুরে বাড়িতে স্নানাহার করে তো ? বারোটা-একটার সময় বাড়িতে থাকে তো ? আমি সেই সময়ে যাব।

প্রতাপ মাথা হেঁট করে থাকে।

পরদিন সকালেই আলোক আসে—হ্যাটকোট-পরা আলোক। রকম দেখেই টের পাওয়া যায় মরিয়া বাপের খাতিরে অগত্যা বাধ্য হয়ে এসেছে—ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে এসেছে।

জুতো পায়েই কুঁড়েতে ঢোকে।

জগদীশ বলে, এসো। আমি জানতাম তুমি আসবে। বোসো। জগদীশ হুকুম দেয়, সাবকে চৌকি দে জিরাই।

পরক্ষণে হাজির হয় বাঁশ আর বেতে বোনা হাতখানেক উঁচু মোড়া জাতীয় টুলটা।

আর বছর এক ব্যাটা ইংরেজ এসেছিল। লন্ডনে ছিলাম বছর দেড়েক, তখন আলাপ হয়েছিল। আলাপ হতেই প্রথম কথাটা কী বলেছিল জানো ? আমি ভারতকে জানতে চাই, আমি ভারতকে নিয়ে বই লিখতে চাই। ভেবেছিলাম আমায় খাতির করে বলছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে টের পেলাম—ভারত সম্পর্কে ব্যাটার কৌতূহলের সত্যি সীমা নেই।

বাঁশ ও বেতের টুলটায় আলোক সন্তর্পণে বসে। আসনটা বেশ শক্ত টের পেয়ে সে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে পাইপ ধরায়।

বলে, আপনি যে বিলাতে গিয়েছিলেন আমি তা জানি। কয়েক বছর পরে গিয়েও আমি শুনে এসেছি আপানার সব কাণ্ডকারখানার কথা।

সে তো শুনবেই। এককাঁড়ি টাকা নিয়ে বিলাত গিয়ে আমি তো ইংরেজ হবার চেষ্টা করিনি। ভারতের টাকাকে ইংরাজ মেয়েরা কত খাতির করে তাই দেখাতে চেষ্টা করছিলাম।

ইংরেজ মেয়েরা খুব সস্তা দেখে এসে মনের দুঃখে ভারতীয় যোগী বনেছেন ?

না ! দু-একটা সস্তা মেয়ে দেখে অন্য মেয়েদের সঙ্গে মিশেই টের পেলাম—না, টাকা দিযে সুবিধা হবে না। এই জঙ্গলে এসে কত বছর ধরে বুঝবার চেষ্টা কবে মেয়েদের সম্পর্কে সাব কথাটা কী জেনেছি জানো ?

মেয়েরা কোনো দেশে সস্তা নয়, মেয়েরা সব দেশে মা। বেশ্যা মানে কী বুঝেছি জানো ? মা হতে অক্ষম কিছু মা অগত্যা বেশ্যা হয়েছে বাপেদের মুখ চেয়ে—মেয়েমানুষকে তারা মা মনে করে, মায়েদের যারা খেতে পরতে দেয়।

আলোক হাতঘড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে বলে, আমি ভক্তি জানাতেও আসিনি, তর্ক করতেও আসিনি। বাবার তাগিদে এসেছি। কাজের কথাটা মিটিয়ে দিলেই আমি বিদেয় হতে পারি।

বিদেয় হও ! বাপের টাকা আছে—বাপের খাতিরে অগত্যা বাধ্য হয়ে এসে আমার কথা শুনবে, আমি কি সে জন্য তোমায় ডেকেছি ? বাপের খাতিরে আসতে পারবে অথচ বিরক্তি চাপতে পারবে না—এ রকম সস্তা খাতির করো কেন বাপকে ? আলোকের মুখে হাসি ফোটে।

সে চুপ করে থাকে।

জগদীশ ধীরে ধীরে বলে, আমার চেয়ে তুমি মহাপুরুষ। তোমার পেটে অনেক বেশি বিদ্যা। নিজের স্ত্রীর দেহের খুঁত ধরতে পারো না ? চিকিৎসা করাতে পারো না ? ললিতা আমার মেয়ের মতো—তবু সত্যিকারের মেয়ে নয়, তাই আজ বেঁচে গেলে। তুমি সত্যিকারের জামাই হলে আজ এই মদের বোতল দিয়ে তোমার মাথা ফাটিয়ে দিতাম।

সিগারে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আলোক বলে, কেন ডেকে পাঠিয়েছেন মোটামুটি অনুমান করেছিলাম। বিরক্ত হয়েছি সেই জন্যই। জানেন না বোঝেন না, সব ব্যাপারে আপনার মাথা গলানো কেন ? আবার সিগারে টান দিয়ে বলে, আপনার মেয়ের দেহে খুঁত ? অনেক স্পেশালিস্ট ডাক্তার দেখিয়েও ধরা যায়নি কোথায় কী খুঁত। তার মানেই খুঁতটা ওর মনে। মানসিক চিকিৎসা করাব বলেই তিন মাসের ছুটি নিয়ে এসেছি। সেদিন রাত্রে একা ললিতা আপনার কাছে এসেছিল, আমি কি জানি না ভেবেছেন ? বাড়ির কারও নজর এড়িয়ে চুপিচুপি স্বয়ং ভগবানকে দেখতে যাবার সাধ্য আছে কোনো মেয়েবউয়ের ? ওর দেহে কোনো খুঁত নেই। ওর অসুখটা মানসিক।

সুদর্শনাও এই কথা বলেছিল—জগদীশ বিশ্বাস করতে পারেনি। ললিতার মধ্যে এ রকম একটা মানসিক রোগ বাসা বেঁধে আছে, নিজের সুস্থ সবল নিখুঁত দেহটার একটা কাল্পনিক খুঁত আছে বিশ্বাস করে স্বামীর ভয়ে দিশেহারা হবার মতো মানসিক রোগ—এখনও সেটা বিশ্বাস হতে চায় না।

সে ধীরে ধীরে বলে, সাধারণ অবস্থায় রোগটার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না ?

না। আমি আসব জানলে শুরু হয়, ক্রমে ক্রমে বাড়ি আসবার পর দু-চারদিন থাকে—তারপর মিলিয়ে যায়। বাপের বাড়ি যদি পালিয়ে যায়—আমি আসবার দু-তিনদিনের মধ্যেই যায়। ওই পিরিয়ডটা কেটে গেলে সব ঠিক হয়ে যায়।

তোমার কাছে রাখো না কেন ?

আমার সুবিধে হয় না, তাই।

জগদীশ গম্ভীর হয়ে খানিক ভাবে। ধীবে ধীরে বলে, মানসিক রোগটা যখন খুব চড়া সেই অবস্থায় তাহলে ললিতা সেদিন রাত্রে এসেছিল ? তবু আমি ধরতে পারিনি ?

আলোক সহজভাবেই বলে, মানসিক রোগ বলে ধরবার চেষ্টা করেননি, তাই পাবেননি। চেষ্টা করলে আপনিও পারতেন। আলোক আরেকটা সিগার বার করে ধীরে-সুস্থে ধরায়। সিগারটা ভালো করে ধরিয়ে জোরে টেনে একরাশি ধোঁয়া ছাড়ে।

খানিক আগে খোঁচা দিচ্ছিলেন, বাবার টাকা আছে, বাবার খাতিরে তাই বাধ্য হয়ে আমাকে আসতে হয়েছে। খাতিরটা বাবার—সে তো আপনিও জানেন, আমিও জানি। তবে কিনা আপনার জানাটা একটু বাঁকা রকম হয়ে গেছে। আপনি ভেবেছেন, বাপের অনেক টাকা আছে, বাপ মরলে ভাগ পাব, তাই বাপের হুকুমে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি ! আপনার কি জানা আছে, ভাইবোনদের অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছি বাবার টাকা-পয়সা বিষয়-সম্পত্তির অংশ আমি দাবি করব না ?

প্রতাপ জানে ?

জানেন বইকী। জেনেই তো চটে আছেন আমার ওপর। যা ইনকাম হয় তা দিয়ে কী করব ভেবে পাই না, ভাইদের সঙ্গে খ্যাঁচাখেঁচি করে কী হবে ? আমি তাই জানিয়ে দিলাম, আমি ভাগ চাই না, বাবার যা কিছু আছে ভাইরা ভাগ করে নেবে। তারপরই বাবার কী রাগ ! তর্জন-গর্জন করে আমায় শাসাতে লাগলেন, ত্যাজ্যপুত্র কববেন। কী করি, বুড়ো বাপকে তো আর—

জগদীশ হাত বাড়িয়ে দিতেই আলোকও হাত বাড়ায়—ঘনিষ্ঠ রকম কবমর্দন হয় দুজনের মধ্যে।

তারপর কয়েক দিন জগদীশ ভয়ানক গম্ভীর হযে থাকে—কারও সঙ্গে দেখা করে না। বলে, রত্নাকর, আমি ক-দিন ভাবব। নেশার জন্য কি সেদিন রাত্রে ললিতাকে দেখেও ব্যাপার বুঝতে পারিনি ?

## একাদশ অধ্যায়

এত হিংসা কেন জলধির ?

এতকাল পরে কেন এমনভাবে উথলে উথলে উঠল জগদীশের উপর তার অন্ধ ক্রোধ আর বিদ্বেষ ?

চিত্রার জন্য জগদীশের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা ছিল অত্যন্ত মার্জিত। চিত্রা তার মনের কথা জানাবার পর সে বিবাগীও হয়নি, রাগে দিশেও হারায়নি।

শুধু একটু সংযত করে নিয়েছিল চিত্রার সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, একটু দূরত্ব এনেছিল জগদীশের সঙ্গে পরিচয় মেনে নেওয়ার ভদ্রতা রক্ষায়।

জগদীশের জন্যই শোচনীয় দুর্ঘটনায় চিত্রার মরণ ঘটেছে জেনেও হিংসায় উন্মাদ হয়ে আঘাত হানতে চায়নি।

জগদীশের ভয়াবহ আত্মনিগ্রহের খবর জেনে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেবার সাধটা কি তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল তার কাছে ? শুধু কৌতূহলের বশে জগদীশকে দেখতে এসে তার কল্পনাতীত রূপান্তর আর মানুষের কাছে সম্মান দেখে, তার হৃদয়-মন শান্ত হয়েছে দেখে, ছোটোলোক ভদ্রলোক মানুষের একটা বিরাট অংশ তাকে আপন করে নিয়েছে দেখে—এতকাল পরে আবাব কি দাউদাউ করে জ্বলে উঠল হিংসার আগুন ?

চিত্রাকে যে এক রকম হত্যা করেছে সে প্রাণান্তকর প্রায়শ্চিত্ত চালিয়ে যাক—তাকে চিত্রার হত্যাকারী ধরেও সমস্ত ব্যাপারটার জন্য আপশোশ করার উদারতা জলধির আছে।

কিন্তু ওভাবে প্রায়শ্চিত্ত চালিয়ে যাবার জন্যই মানুষের কাছে সে প্রায় মহাপুরুষ হয়ে উঠবে, জীবনের সঙ্গে নিবিড়তর যোগাযোগ ফিরে পেয়ে শান্তি পাবে—এটা সহ্য করা কি সম্ভব নয় জলধির পক্ষে ?

তিন মাস পরে তাই সে আবার তোড়জোড় বেঁধে ফিরে আসে আঘাত দিয়ে জগদীশকে চুরমার করে ফেলতে ?

উচ্চপদের সম্মান, ক্ষমতা, দায়িত্ব, শান্ত স্বামীভক্তিপরায়ণা শিক্ষিতা রূপসি স্ত্রী—সব যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে !

জগদীশকে আঘাত করা চাই ! চিত্রার মরণকে অতিক্রম করে জীবনের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে বলে ওকে জব্দ করা চাই, ধ্বংস করে দেওয়া চাই।

নতুবা জীবন বৃথা।

আদিবাসীদের এলোমেলো বিক্ষোভের আগুন চাপা পড়ে ধিকিধিকি জ্বলছিল। এখানে-ওখানে সীমাবদ্ধ অঞ্চলে হঠাৎ দাউদাউ করে জ্বলে উঠে ঝিমিয়ে যাচ্ছিল। এমন কিছু ব্যাপার নয় যে একটু বিব্রত হবার বদলে কর্তাদের সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতে হবে।

জলধিই নাকি ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে অদূর ভবিষ্যতের সাংঘাতিক পরিস্থিতির কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে উঁচুতলায় কর্তাদেরও ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

সে যখন এত জানে বোঝে, সে যখন ধরতে পেরেছে জগদীশের আশ্রম থেকে কীভাবে আদিম রহস্যময় কৌশলে চারিদিকে বুনো জংলি মানুষগুলিকে খেপিয়ে তোলার আঁটঘাট-বাঁধা গোপনে

অভিযান চলছে—তাকেই ভার দেওয়া যাক বিক্ষোভ ও অসন্তোষের নিবুনিবু আগুনটা একেবারে ছাই করে ঠান্ডা করে দিয়ে ফুৎকারে শূন্যে উড়িয়ে দেবার।

ক্রোধ আর বিমর্ষতা মেশানো মুখখানায় পাউডার পর্যন্ত ছোঁয়াতে ভুলে গিয়ে সুদর্শনা আসে।

জগদীশকে বলে, আপনি কিন্তু সাবধান থাকবেন।

রত্নাকরকে বলে, তুমি কিন্তু আরও বেশি সাবধান। তুমিই নাকি ওনার দক্ষিণ হস্ত। ওঁকে জেলে দিয়ে যদি কাজ চলে—তোমাকে ফাঁসি দিতে হবে।

জগদীশ হাসিমুখে বলে, দিক না ফাঁসি—আমাদের দুজনকেই দিক। মরবার জন্য কতকাল আমরা ছটফট করছি—বেচারা আমাদের দুজনের এত ঝঞ্ঝাট !

সে হালকা সুরে ব্যাপারটার গুরুত্ব উড়িয়ে দিয়ে সুদর্শনাকে ধাতস্থ করতে চায়, বোঝাতে চায় যে একজন পদস্থ ক্ষমতাবান লোকের প্রতিহিংসার পাগলামিতে ভয় করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া লক্ষ কোটি গুণ ভালো।

রত্নাকর কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মানুষের মতো সিধে হয়ে যায়, প্রায় আর্তস্বরে আপশোশের আওয়াজে বলে, ইস ! এই সোজা কথাটা খেয়াল হয়নি আমার ! জ্বলে-পুড়ে মরে যাচ্ছি নিজের যন্ত্রণায়, পাগলের মতো ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছি চারদিকে, যারা বড়ো স্কেলে মানুষ খুন করে তাদের একটাকে মেরে ফাঁসিতে লটকাবার সহজ রাস্তাটা খেয়াল হল না।

অস্ফুট একটা আওয়াজ করে সুদর্শনা। মুখ তার ছাইবর্ণ হয়ে গেছে।

জগদীশ রত্নাকরকে বকুনি দিয়ে বলে, এমনিতেই সোনা ভয়ে-ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে, ঢং করে কেন ওকে ভড়কে দিচ্ছিস রতন ? যা খেয়াল হবার ছিল না তা খেয়াল হয়নি—সোনার কথা শুনে খেয়াল করে এ রকম করতে হয় ? বড়োদরের একটা খুনেকে খুন করে ফাঁসির সুখ পাওয়ার কথা ভাবছিস মনে করে ওর দম আটকে আসছে দেখতে পাচ্ছিস না ? ঘুরে ঘুরে এত দেখে এত শিখে তোর এটুকু কাণ্ডজ্ঞান জন্মাল না রতন !

জগদীশের বকুনি খেয়ে রত্নাকর সুদর্শনাকে ধমকের সুরে বলে, আমি কি আজকের কথা বলছি ? সে রকম মনের অবস্থা এখন আছে নাকি ? আমি বলছিলাম আগেকার কথা, যখন মরার জন্য পাগল হয়ে উঠছিলাম। তুমি বড়ো ঝগড়াটে, বড়ো অস্থির। একজন একটা কথা বললেই লাফিয়ে ওঠো। এক মিনিট ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারো না, মানুষটার বলা শেষ হয়েছে কি না, আরও কিছু বলবে কি না—

চুপ করো তুমি।

তীক্ষ্ণ মেয়েলি কণ্ঠে ফেটে পড়া পুরুষালি গর্জন।

জগদীশ একটা বই টেনে নিয়ে পাতা ওলটায়।

সুদর্শনার ধমক মেনে নিয়েও রত্নাকর নির্বিকারভাবেই চুপচাপ বসে থাকে। সুদর্শনা অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে জগদীশের দিকে।

তাদের ব্যাপারে হয়তো কিছু বলতেও পারে জগদীশ !

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটার পর জগদীশ বলে, আজকাল আর কবিতা লেখো না রত্নাকর ? ঝোঁক কেটে গেছে ?

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ রত্নাকরের কবিতার প্রসঙ্গ টেনে আনা !

রত্নাকর বলে, ঝোঁকটা কেটে গিয়েছিল। আজকাল আবার যেন মাঝে মাঝে তাগিদ বোধ করি।

বলে সে সুদর্শনার দিকে তাকায়। এতকাল তাদের পরিচয় হয়েছে, এতকাল তারা জগদীশের সামনে বসেও কত কথা বলেছে, তর্ক করেছে, ঝগড়া করেছে—সুদর্শনাকে জগদীশ কখনও লজ্জা

পেতে দ্যাখেনি। আজ তার মুখ লাল হয়ে যেতে দেখে জগদীশ একটু হাসে। বলে, তোমাদের একটা কথা বলব, আমার বিনয় ভেবো না। আমিও সংসার ছেড়েছিলাম, রতনও ছেড়েছিল। ওটা স্টার্টিং পয়েন্ট ধরে হিসাব করলে দেখা যাবে রতন অনেক নতুন চিন্তা আর অভিজ্ঞতার খোরাক পেয়েছে, আমি পেয়েছি সামান্যই।

রত্নাকর বলে, কী যে বলো তুমি দাদা ! তোমার সঙ্গে আমার তুলনা !

সুদর্শনা বলে, আপনি সত্যি বিনয় করে এটা বললেন—কিংবা তামাশা করলেন !

জগদীশ বলে, না না, কথাটা সত্যি। এটা বুঝবার পরেই অনেক ব্যাপার আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। বনে গিয়ে হাজার বছর চিন্তা করেও কেউ জ্ঞান বাড়াতে পারে না। আমিও পারিনি।

দুজনে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

সংসার ছাড়ার সময় হয়তো রতনের চেয়ে আমার জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতা বেশি ছিল, এখনও হয়তো রতন চিন্তার ওজনের হিসাবে আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না—আমি সে কথা বলছি না। আমি বলছি নতুন চিন্তার কথা, জ্ঞান বাড়ার কথা। এখানে পালিয়ে আসার পর আমি কতটুকু নতুন চিন্তা পেয়েছি, কতটুকু জ্ঞান বেড়েছে ? এতকাল একা একা দিনরাত ভেবে ভেবে আমি কী করেছি ? আগে সঞ্চয় করা এলোমেলো চিন্তাগুলি শুধু ঝেড়ে-ফুঁকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়েছি, মিলিয়ে নিয়েছি, যোগ-বিয়োগ করে কী দাঁড়ায় বার করেছি। তাছাড়া উপায় ছিল না। মানুষকে ছেড়ে জঙ্গলে এসে একলা হওয়া মানেই মনের ভাঁড়ারে ঢুকে ভেতর থেকে খিল এঁটে দেওয়া—ভাঁড়ারে যা ছিল তাই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা। আনকোরা নতুন চিন্তা আসবে কোথা থেকে, জ্ঞান বাড়বে কী করে ? ভবঘুরে হয়েও রতন থেকেছে মানুষের মধ্যে, নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছে, নতুন চিন্তা মনের ভাঁড়ারে তুলেছে।

সুদর্শনা প্রায় কাতরভাবে বলে, তবে কি বলছেন আপনার সাধনা নিস্ফল হয়েছে, নতুন কিছুই পাননি ?

জগদীশ বলে, নতুন কিছু না পেলেও জঙ্গলে আসা নিস্ফল হয়েছে বলব না। এ রকম একলা হয়ে দিন না কাটালে এলোমেলো খেই হারানো চিন্তার যে স্তূপটা জমেছিল সেটা ঘাঁটা হত না, যাচাই করে করে জঞ্জাল সাফ করা হত না, মিলিয়ে জোড়া দিয়ে আসল ভাবনাগুলি স্পষ্ট করা যেত না। এদিক দিয়ে বনে আসা নিস্ফল হয়নি তবে আত্মচিন্তার সুযোগ মিলেছে।

জগদীশ একটু হাসে।

আগে বুঝতাম না তোমরা কেন আমার কথা শুনে খুশি হও—বতন আমায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছে। আত্মচিন্তাও সাধনা বইকী, চিন্তার জট ছাড়ানো কী সহজ ব্যাপার ! নতুন চিন্তা না জুটুক, চিন্তার জট ছাড়িয়েছি। এই সাধনাকে তোমরা সম্মান করো। তোমরা এলোমেলো চিন্তায় হাবুডুবু খাও, আমি চট করে আসল কথাটা ধরিয়ে দিতে পারি।

রত্নাকর সোৎসাহে বলে, দাদা, বলিনি তোমায়, সংসার কাউকে ছাড়ে না, নিজের দরকারে ছুটি দেয় ! হাড়েহাড়ে এটা আমি টের পেয়েছি। সংসার বলে, তুমি পাগলাটে, মানিয়ে চলতে পারছে না—যাও খুশিমতো মন্দির থেকে আঁস্তাকুড় ঘাঁটবে যাও, খুশিমতো চিন্তা করবে যাও, তোমার ছুটি মঞ্জুর। আমরাও জানতে বুঝতে চাই—কিন্তু আমাদের সময় কই, সুযোগ কই ? যখন কিছু জানতে বুঝতে পারবে, আমাদের জানিয়ে বুঝিয়ে দিয়ো !

জগদীশ হাসিমুখে সায় দিয়ে বলে, এবার বুঝলি তো আমার চেয়ে নতুন চিন্তা তুই বাড়িয়েছিস ঢের বেশি ?

এলোমেলো নতুন চিন্তা নতুন অভিজ্ঞতার পাহাড় দিয়ে কী হয় ?

শুধু জমানো চিন্তার জট ছাড়িয়ে নিলেই বা কী হয় ?

সুদর্শনা ঠিক ধরতে পারছে না বুঝে জগদীশ বলে, চিন্তার জট খুললাম—তারপর ? থেমে তো গেলাম সেইখানে। আমিও থেমে গিয়ে পাগল হতে বসেছিলাম—তোমরা এসে পাকড়াও না করলে নির্জনে আপন মনে আত্মচিন্তার শেষ কী দাঁড়াত কে জানে ? তোমরা এলে, নতুন চিন্তা এল, তবেই না আরেকটু বেশি বুঝবার প্রক্রিয়া আবার চালু হল ! জানাটা আলো জ্বালিয়ে রাখার মতো—জ্বেলে যেতে হবে, আলো নেভালেই অন্ধকার।

জগদীশ জোর দিয়ে বলে, না, আত্মচিন্তার জন্য বনে এসে লাভ নেই—ওটা ভালোভাবে হয় না। মানুষের মধ্যে থেকে এটা চালিয়ে গেলে আরও কত জানতে পারতাম।

জগদীশ হাসে।—আমি অবশ্য আত্মচিন্তা করতে আসিনি, এসেছিলাম সুস্থ হতে। সুস্থই বা কই হলাম ? তোমরা এসে বরং খানিকটা সুস্থ করেছ।

বিদায় নিতে উঠে দাঁড়িয়ে সুদর্শনার খেয়াল হয়, যে বিষয়ে সাবধান করে দেওয়ার জন্য সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে সেই বিষয়টাই চাপা পড়ে গেছে।

এমনভাবে মানুষকে ভুলিয়ে দিতে পারে জগদীশ। জলধির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জগদীশ প্রায় কিছুই বলেনি।

প্রশ্ন করতেই মুখ একটু বিষণ্ণ হয়ে যায়। ভয়-ভাবনা হয়নি জগদীশের, মনটা খারাপ হয়ে গেছে।

ও কথাই ভাবছি মেয়ে। সবজান্তা ভাব আমাকে—এর এই বিকারের মানে বুঝতে পারছি না। ওর রাগের কারণ হিংসার কারণ বুঝতে পারছি—কিন্তু এমনভাবে মাথায় চড়ে যাবে কেন ? স্বার্থবুদ্ধি বিচারবুদ্ধি তো কম নয় মানুষটার, কাণ্ডজ্ঞানের অভাব নেই। আমাকে ঘায়েল করার সাধ জাগলেও নিজের বিপদের কথা ভাবছে না ? চারিদিকে হইচই পড়ে যাবে কত লোক খেপে যাবে—ওর চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাবেই। কোন বিকার কোথায় চড়লে এভাবে সমস্ত বিচার তুচ্ছ হয়ে যায় ধরতে পারছি না।

রত্নাকর বলে, আগের জেলাসিটাই হয়তো—

জগদীশ মাথা নাড়ে।—জেলাসি তোমার কাছে একটা ভয়ংকর ব্যাপার। তুমি জেনে রেখেছ জেলাসি মানুষকে দিয়ে সব করাতে পারে—হঠাৎ ঠেকে গিয়ে জগদীশ বলে, পরে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব, কেমন ?

রত্নাকর সুদর্শনার দিকে চেয়ে বলে, এখুনি বলো না দাদা—পরে কেন ? তোমার সোনাকে আমার কীর্তির কথা জানাতে কি বাকি রেখেছি ? তবে আর কী শিখলাম তোমার কাছে !

অন্যকে বলি না বলি এসে যায় না—ওর কাছে গোপন করতে পারি সে সব কথা !

জগদীশ খুশি হয়ে বলে, আবার দেখলি তো, আমি সবজান্তা নই, ভুল করেছিলাম ? সোনাকে সব যদি বলেই থাকিস, তবে তো তোদের চরম বোঝাপড়া হয়ে গেছে ! যতই ঝগড়া করিস, তোদের মনের মিল কে ঠেকায় ? আর আমি তোকে বকব না রতন !

রত্নাকর হেসে বলে, না না, মাঝে মাঝে বোকো—নইলে জমবে না। কিন্তু চাপা জেলাসি হঠাৎ জ্বলে উঠে আমার মতো জলধির মাথা খারাপ করে দিয়েছে, এটা ঠিক নয় ?

না, শুধু জেলাসি অতটা চড়ে না, এ রকম বিকার এনে দেয় না। জেলাসি হিংসা নয়, ওতে লড়াই করার জিদ থাকে। আরেকজনকে হার মানিয়ে হটিয়ে দিয়ে জয়ী হবার ঝোঁক থাকে। জেলাসি খারাপ নয়, অনিয়ম নয়। জেলাসি ছাড়া প্রেম জমে না। প্রেম না জমলে জীবনের ধারা চালু রাখার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে ক-জন রাজি হবে ? অন্য বিকার থাকল সেটাই জেলাসির ঝাঁঝে চড়ে গিয়ে মানুষকে উন্মাদ করে দেয়।

রত্নাকর আরও উৎসাহিত হয়ে বলে, কথাটা তো ঠিক বলেছ মনে হচ্ছে ! আরেকটা নতুন পাঠ তো শিখালে ! হুঁ, ঠিক কথা, আরও কত জ্বালায় যে তখন জ্বলছিলাম, কতভাবে পাগল হয়ে

উঠেছিলাম খেয়াল করিনি তো ! আরও অনেক কিছু ছিল, ক-দিন আগে মা মরে গিয়েছিল—বিনা চিকিৎসায়, বিনাযত্নে।

হঠাৎ যেন অন্য মানুষ হয়ে যায় জগদীশ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। মুখের ভাব অন্য রকম হয়ে যায়। এতক্ষণ বসে বসে কথা বলছিল, এবার উঠে এসে তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

এবারে বুঝেছি। তুই আমাকে আবার সূত্র ধরিয়ে দিলি রতন ! জলধি একা এসেছে, না !

সুদর্শনা বলে। একাই এসেছেন বলা যায়, শুধু মেয়েটাকে সঙ্গে এনেছেন। ওর একটি ছেলে, একটি মেয়ে, ছেলেটিকে নিয়ে ওর স্ত্রী ভিন্ন থাকে—

বুঝেছি—রতন ধরিয়ে দিতেই অনুমান করেছি। খুব সুন্দরী, একটু সেকেলে বউ না ?

সুদর্শনা চমৎকৃতা হয়ে বলে, কী করে জানলেন আপনি ?

এটা জানা কঠিন কী। আমাকে উপলক্ষ করে চিত্রার শোকটা বিকার হয়ে মাথায় চড়ে যাবার কারণ থাকবে তো। ওর বেলা কারণটা থাকবে ওর সাংসারিক জীবনেই।

কয়েক মুহূর্ত জগদীশ গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে নিথর নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর আবার একটা নিশ্বাস ফেলে, ঠিক যেন মেয়ে-জামাইকে বিদায় দিচ্ছে এমনি স্নেহের সুরে বলে, আচ্ছা, এবাব তোমরা এসো, রাত হয়ে গেছে।

## দ্বাদশ অধ্যায়

দিন দিন অশান্তি বাড়ে। অস্বস্তি তীব্র হয়।

এত ভয় ভক্তি বিশ্বাস ভালোবাসার প্রতিদানে কী সে দিচ্ছে মানুষকে প্রতিদান ?

কতগুলি ছাঁকা কথা। আর ফাঁকা উপদেশ।

যদি সত্যও হয় রত্নাকরের কথা, একটি মেয়ের পার্থিব প্রেমকে উপলক্ষ করে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক চিন্তা ও অভিজ্ঞতা মন্থন করতে করতে সে যদি সন্ধান পেয়ে গিয়েও থাকে অমৃতের, জর্জরিত উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের কাজে লাগায় যদি মূল্যবান হয়ে উঠে থাকে তার মুখের কথা—সেটাও তো শেষ কথা নয়। সে তো মনে মনে জানে ভক্তদের প্রশ্রয় দেবার আরেকটা কারণ—তারই অতি বাস্তব প্রয়োজনের কারণ।

ওরা শুধু ভক্তি করে না, পয়সাও দেয়। নেশা করতে মোটা রকম পয়সা লাগে।

সে অবশ্য ফেলে ছড়িয়ে রেখে এসেছে অনেক টাকা, কিন্তু সে তো নগদ টাকা নয়। কিছু অংশ উদ্ধার করতেই অনেক হাঙ্গামা পোয়ানো দরকার।

নেশার খরচের চেয়ে ঢের বেশি টাকা আসছে প্রণামিতে।

সে চায় না।

কিন্তু সকলে দেয়। এবং সে জানে যে ওরা পয়সা দেবে। ওরা প্রণামি দেবে জানে বলেই এমন নির্ভয়-নিশ্চিন্ত মনে সে মহাসমারোহে নেশার পাল্লা চালিয়ে যেতে পারছে।

আবার এটাও তো সত্য নয় যে শুধু প্রণামির প্রয়োজনেই সে ভক্তদের বরদাস্ত করে এসেছে প্রথম থেকে।

ওরাও তো তাকে কম খাটিয়ে নেয় না।

কম ভাবায় না। কম বকায় না।

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা তবে কী ?

এ প্রশ্ন আর শুধু প্রশ্ন থাকে না। কূলকিনারা পেতে শুধু ভেবেই কুলোনো যায় না। একটা যন্ত্রণায় দাঁড়িয়ে যায়। দিন দিন বেড়ে চলে সেই যন্ত্রণাবোধ।

অস্থিরতা, বদমেজাজ, অন্যমনস্কতা, কথা বলার মধ্যে আগের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র তীক্ষ্ণ ও গভীর ব্যাকুলতা, কথা বলতে বলতে হঠাৎ নির্বাক নিশ্চল সমাহিত হয়ে যাওয়া—এ রকম অনেক ধরনের লক্ষণের মধ্যে ভক্তদের কাছে প্রকাশ পায় যে কোনো একটা বিষম রকম প্রক্রিয়া চলছে জগদীশের মধ্যে।

কেন ঘটছে আর কী ঘটছে তারা বোঝে না।

অনেক দিন প্রাণপণে সংযম রক্ষা করে সুদর্শনা সকলের সামনে ধমক খাবে জেনেও জিজ্ঞাসা না করে পারে না : আপনার শরীরটা কি ভালো যাচ্ছে না ?

কী চিন্তায় বিভোর হয়েছিল জগদীশ সেই জানে, রেগে উঠে ধমক দেওয়ার বদলে মেঘ কেটে গিয়ে একঝলক রোদ ছড়িয়ে পড়ার মতো হঠাৎ তার মুখে হাসি ফোটায় সকলে পরম স্বস্তিবোধ করে।

ললিতাও সাহস করে বলে বসে, আমরা বড়ো ভাবনায় পড়ে গেছি। সাধনার কোনো নতুন স্তরে উঠবার সময় কি— ?

সমস্ত মুখ দিয়ে প্রশান্ত হাসি হাসে জগদীশ। কপালের চামড়ার দুটি কুঞ্চিত রেখায় পর্যন্ত যেন হাসি ঝলক মারে।

পরম স্বস্তি আর পরম আনন্দে উদ্‌বেল হয়ে ওঠে সকলের মন।

উৎসুক হয়ে ওঠে।

এতগুলি মন আর সবকিছু ভুলে গিয়ে মনোযোগ দেয় জগদীশে।

না জানি জগদীশ কী অপূর্ব আশ্চর্য কথা বলবে, শুনতে শুনতে উত্তেজিত জর্জরিত দেহমন রোমাঞ্চিত হতে হতে কাটিয়ে উঠবে দুঃখ-বেদনা, হীনতা-দীনতা-বোধের অভ্যস্ত বাঁধন, সুমহান অনুভূতির আনন্দসাগরে সাঁতার কাটার সুযোগ মিলবে।

যতক্ষণের জন্যই হোক !

জগদীশ মুখ খোলে।

শহরের ঘরে ঘরে বিদ্যুতে আলো জ্বালায়, শহরে আলো জ্বালা কত সহজ। সুইচটা টিপতেই ঘর আলো হয়ে যায়। শহরে একদিন সন্ধ্যা নেমেছে। নামকরা একজন বড়ো অধ্যাপক দশটা ক্লাসে হিট, লাইট, ইলেকট্রিসিটি ব্যাখ্যা করে করে বাড়ি ফিরে নিজের বই গাদা-করা ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইলেন গালে হাত দিয়ে। ঘর অন্ধকার। এখন কী করা যায় ?

সুদর্শনা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আমি বুঝেছি আপনি কী বলবেন !

জগদীশ হাসিমুখেই মাথা নাড়ে, তুমি ভূমিকাটুকু বুঝেছ—আসল কথা বোঝোনি। আসল কথাটা তুমিই আমায় বুঝিয়েছ। না জেনে না বুঝে মায়ের স্নেহে মেয়ের ভক্তিতে ব্যাকুল হয়ে একটা প্রশ্ন করে বুঝিয়ে দিয়েছ।

খুব বড়ো একজন ডাক্তারের আজ এই আসরে প্রথম পদার্পণ ঘটেছিল।

প্রতাপই টেনে এনেছিল তাকে।

মাঝে মাঝে মৃত্যুভয় দেখিয়ে কয়েক দিন ওষুধপত্র খাইয়ে নিয়মে চালিয়ে প্রতাপকে মরণ ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে বেঁচে থাকতে সে সাহায্য করে।

ডাক্তার সেন হেসে বলে, মায়েরা আর মেয়েরাই বুঝি সাধককে প্রেরণা দেন ? বাপেরা আর ছেলেরা কোনো কাজে লাগে না ?

গম্ভীর হয়ে যায় জগদীশের মুখ। বলে, অন্য কাজে লাগে—সাধনার কাজে লাগে না।

কেন ?

বাপ আর ছেলে শুধু যাচাই করে—আদায় করে। তাদের শুধু ছাঁকা বিচার, ছাঁকা বিবেচনা—দায়দায়িত্ব কর্তব্য-কর্তালি ভাগাভাগির সম্পর্ক। ছেলে বিয়োবার সাধ্য নেই, পুরুষের, তাই বাধ্য হয়ে মেয়েদের শুধু মা হবার দায়টা দিয়েছে। একবার মা হবার বছরখানেকের সাধনা কী ব্যাপার তুমি ডাক্তার হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনেও অনেক কিছু জানো না ডাক্তার ! নারীপুরুষে মিলন হল, ডিম্বকোষে প্রাণের পত্তন হল—

ছেলেমানুষি দুষ্টামিভরা হাসি মুখে ফুটিয়ে রেখে খানিকক্ষণ সকলের মুখে চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে সে সশব্দে হেসে ওঠে।

আরে না না, ভয় নেই। অশ্লীল কথা বলব না। অত বোকা আমি নই। আমি কি একটা মেডিকেল কলেজের মড়াকাটা ঘর বানিয়েছি যে কথার ছুরিতে মেয়ে-পুরুষের দেহ কেটে কেটে তোমাদের দেহ চেনাব ? তোমরাও এক-একটা দেহের মালিক আমি ভুলে গেছি ভেব না। দেহের ঝঞ্ঝাট নিয়ে অনেকবার ডাক্তারের কাছে গিয়ে প্রণামি দিয়ে ধন্না দিয়েছ তাও আমি জানি। তোমাদের বলিনি বুঝি আমি ডাক্তার হতে বিলাত গিয়েছিলাম ?

মেয়েদের কে একজন বলে, ওমা ! তা তো জানতাম না ! পুরুষদের একজন বলে, ডাক্তারি শিখতে বিলেত গিয়েছিলেন ! জগদীশ গম্ভীর হওয়ামাত্র সকলে নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

ছোটোলোক চাষাভুষো একটা মুখ্যু মেয়ের মা হবার সাধনা কী ব্যাপার আমরা হিসাবে ধরি না বুঝি না বলে, ডাক্তাররা খেয়াল করে না বলে আমাদের এই অবস্থা। ডাক্তার জেনেছে মেয়েরা নিছক

মা হবার যন্ত্র—ভাঙা কুঁড়ে থেকে রাজার বাড়িতে প্রত্যেক মা কী সাধনা চালায় সে খবর কি ডাক্তার রাখে ? দু-চারবার ফরসেপ দিয়ে বাচ্চা টেনে বার করে দু-চারটা মা আর বাচ্চাকে বাঁচিয়ে ডাক্তার ভাবেন সৃষ্টিরহস্য বুঝে গিয়েছি। আমাদের এই তিপ্পাইয়ের মা সেদিন ভোরবেলা কতগুলি ফুল দিয়ে আমায় প্রণাম করল। দেখেই বুঝলাম একটা গোলমাল হয়েছে নিশ্চয়। প্রণাম করে মাথা তুলতে তুলতেই একটা অদ্ভুত আওয়াজ করল। ঘরে ফেরার চেষ্টা করতেই—আমি একধমকে থামিয়ে দিলাম, বিছানায় শুইয়ে দিলাম। অনেক মা-মেয়ে জুটে গেল পাঁচ মিনিটের মধ্যে। এক ঘণ্টার মধ্যে চেঁচাতে চেঁচাতে কালো কুচকুচে একটা বাচ্চা প্রসব করল তাপ্পির মা।

ডাক্তার সেন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, এর মরালটা কী ? আমরা কি জানি না স্বাভাবিক ডেলিভারিতে মায়েদের বিশেষ কষ্ট হয় না ? বড়ো অপারেশন করার সময় রোগীকে অজ্ঞান করতে হয় কেন তার মানে বুঝি না ? আমরা কি চোখ-কান বুজে যন্ত্রের মতো ডাক্তারি চালাই ? ফরসেপস দিয়ে দু-চারটে বাচ্চাকে টেনে বার করে এনে মা আর বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে দেওয়া কি আমাদের অপরাধ ?

অপরাধ ? দু-চারটে মা-কে আর বাচ্চাকে এভাবে বাঁচিয়ে দিতে পারো বলেই তো যারা আমায় সওয়া পাঁচআনা প্রণামি দিয়ে কাজ সারতে চায় তারা তোমার দক্ষিণা দেয় বত্রিশ টাকা। কিন্তু দু-চারটে মা আর দু-চারটে বাচ্চাকে বাঁচাবার জন্য কি তুমি বত্রিশ টাকা প্রণামির গুরুঠাকুর হয়েছ ? হাজার হাজার মা আর বাচ্চা মরুক বাঁচুক তোমার কিছু এসে যায় না ?

এ তো নীতিকথা টেনে আনলেন ! হাজার হাজার মা আর বাচ্চা বিনা চিকিৎসায় মরলে আমারও এসে যায় বইকী, কিন্তু—

জগদীশ প্রশান্তভাবে বলে, আমিও তাই বলছি। এসে যায় কিন্তু একজন ডাক্তার কী করবে ?—ও দায় রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রই ব্যবস্থা করতে পারে। ঠিক কথা। আমি শুধু তোমার এসে যাওয়ার কথাই বলছি। এসে যায়—কিন্তু তোমার একার কিছু কর'র সাধ্য নেই। দরিদ্র মূর্খের দেশ বলে তো পেশাটা তুমি দাতব্য করতে পার না—দু-চারজন করলেও ক-টা মা আর বাচ্চার মরণ ঠেকাবে। কিন্তু এটাই কি সব কথা ? এসেই যদি যায়—শুধু ওইটুকুই বুঝে শেষ হয় ?

সকলে প্রতীক্ষা করে।

জগদীশ গলা চড়িয়ে বলে, না, ওইটুকুই বুঝে শেষ হয় না। সত্যই যদি এসে যায়, আরও অনেক কিছু না বুঝে চলে না। দারিদ্র্য আর অশিক্ষার দেশ কেন বুঝতে হয়—বুঝতে হয় কারা কীভাবে দেশকে এ অবস্থায় রেখেছে। দেশের লোকের বাঁচার রকম হালচাল না বুঝে আবার ও সব বোঝা যায় না। দেশের লোকের দেহমনের ধাত জানা থাকলে তোমরা কি বিজ্ঞান শিখে এমন অজ্ঞানের মতো প্রয়োগ করতে ডাক্তার ! তিপ্পাইয়ের মা-র বেলা গোলমাল হলে, ফি দিয়ে তোমায় ডেকে পাঠালে তুমি কি বিবেচনা করতে যে ফরসেপ দেখেই ওর মা হয়ে বাঁচার সাধ ফুরিয়ে যাবে, টেনে বার করা বাচ্চাটাকে নিজেই হয়তো প্রপাতে গিয়ে বিসর্জন দিয়ে আসবে ?

আসর থমথম করে।

জগদীশ হেসে বলে, পদ্ধতিটা বৈজ্ঞানিক হলেই কী হয় ? প্রয়োগটাও বৈজ্ঞানিক হওয়া চাই। তাই বলছিলাম, হাজার হাজার মা আর বাচ্চা মরে বলে মনে যদিইবা একটু বেদনাবোধ করো—সেটাকে এসে যাওয়া বলে না ডাক্তার। এসে গেলে কোনো অবস্থায় কী রকম ধরনের কোনো মানুষটার উপর প্রয়োগ করছ এটা খেয়াল করে বিদ্যা প্রয়োগ করতে—দেশটাকে আর দেশের মানুষকে জানতে বুঝতে বাধ্য হতে। তবু যে তোমাদের বিদ্যার প্রয়োগ এতটা সফল হয় কেন জানো ? অজ্ঞান মানুষ না জেনে না বুঝে তোমাদের ব্যবস্থা খানিক খানিক অদলবদল করে খাপ খাইয়ে নেয় বলে। এতে বিপদও ঘটে—ঠিকমতো নির্দেশ না মানার জন্য তোমরা রাগ কর, গাল দাও,

আপশোশ কর। কিন্তু খেয়াল কর না যে শুধু রোগটা না ধরে মানুষটাকেও যদি ধরতে, তাকে বুঝে সে বুঝতে পারে মানতে পারে এমনভাবে নির্দেশ দিতে, তাহলে গোলমাল হত না।

জগদীশ চুপ করলে ডাক্তার সেন ধীরে ধীরে বলে, এবার বুঝেছি আপনার কথাটা। ও সব খানিক খানিক বিচার করতে হয়—কিন্তু বিচারটা যে এতখানি গুরুতর ব্যাপার সেটা তলিয়ে বুঝিনি।

ভক্তেরা বিদায় হয়। থেকে যায় ললিতা ও সুদর্শনা। সুদর্শনা ক্ষোভের সঙ্গে বলে, আজেবাজে লোক এসে আপনাকে—

রত্নাকর বলে, আজেবাজে লোক মানে ? তোমার মনের মতো না হলেই বুঝি লোক আজেবাজে হয়ে যায় ?

জগদীশ বলে, তোমরা একটু বাইরে গিয়ে তর্ক করো দিকি—

মায়ের সঙ্গে আমি কথা সেরে নিই।

তারা বাইরে গেলে ললিতাকে বলে, তোমার খুঁত কি সেরে গেছে মা ?

না। আপনি সারিয়ে না দিলে সারবে না।

সে রাত্রে পাগলের মতো ছুটে এসেছিলে—আজ তো তোমায় বেশ তাজা দেখাচ্ছে ? তোমার ভয়-ভাবনা নেই, খুশির ভাব দেখছি। দু-তিনরাত একলা ঘরে খিল দিয়েছিলে, এখন তো তাও দাও না।

মুখখানা বিষণ্ণ করবার চেষ্টা করে ললিতা মৃদুস্বরে বলে, আপনি যে খানিকটা সারিয়ে দিয়েছেন ? একেবারে সারেনি কিন্তু কী করব ? একটু মানিয়ে তো চলতেই হবে, তাই সয়ে যাচ্ছি ?

জগদীশ স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, ধীর গলায় প্রশ্ন করে, সেদিন রাত্রে যে তুমি এসেছিলে, আমায় মাতাল মনে হয়েছিল ?

ললিতা তাড়াতাড়ি বলে, মাতাল ! না না, তাই কখনও মনে করতে পারি ! আমিই তো ভয় পেয়ে গেলাম।

জগদীশ ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত রেখে স্নেহের সুরে বলে, তোমার অসুখ আমি একেবারে সারিয়ে দেব। তোমার জন্য আমি নিজের মস্ত একটা অসুখ ধরতে পেরেছি, তোমার অসুখ ভালো করে না দিয়ে পারি ?

ললিতা জিজ্ঞাসা করে, আপনার কী অসুখ বাবা ?

পরে শুনো—আগে মনটা স্থির করি কীভাবে নিজের চিকিৎসা করব।

হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে জগদীশ বলে, তোমাকে সারাতে আমি কিন্তু কোনো ক্রিয়া-ট্রিয়া করব না—সোজাসুজি তোমার চিকিৎসা করব না। আলোক তোমার যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে—ওই চিকিৎসায় তোমায় সারিয়ে দেবে। আমার যা করার করব, ডাক্তারকেও বলে দেব কী করতে হবে। তোমার অসুখের চিহ্নটুকু থাকবে না।

ললিতা খুশি হয়ে হাসিমুখে চেয়ে থাকে।

ভোররাত্রে একদল পুলিশ নিয়ে বড়ো অফিসার দত্ত আশ্রম ও গাঁয়ে হানা দেয়—সঙ্গে আসে জলধি।

গাঁ ঘিরে রেখে তন্নতন্ন করে খানাতল্লাসি চালানো হয়।

রত্নাকরকে গ্রেপ্তার করা হয় সঙ্গে সঙ্গে।

তার নামে ওয়ারেন্ট ছিল।

দত্ত জগদীশকে বলে, এর আসল নাম জীবন, খুনি আসামি, শুনলাম আপনি জেনে-শুনে ওকে আশ্রয় দিয়েছেন।—

জেনে নয়, শুনে।

যাই হোক, ওকে আশ্রয় না দিলে হয়তো হঠাৎ এভাবে সার্চ করতে আসতে ইতস্তত করতাম। তেমন কোনো পজিটিভ সূত্র আমরা পাইনি। আসল উদ্দেশ্য ওকে অ্যারেস্ট করা—সার্চ ফর্মাল ব্যাপার।

জলধির দিকে চেয়ে জগদীশ বলে, নিজে হানা দিয়ে নিজের হাতে আমায় গুলি করে মারার সাধ মেটাতে পারলে না জলধি—এত চেষ্টা করেও আশেপাশে বুনোদের খেপিয়ে অজুহাত তৈরি করতে পারলে না ? আমার হুকুমে ওরা উসকানিতে সাড়া দেয়নি—নইলে হয়তো খেপত।

দত্ত আশ্চর্য হয়ে তার কথা শোনে।

জগদীশ আবার বলে, তবে ঘা তুমি সত্যই দিলে জলধি,—আমার ছোটোভাইকে ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা করলে !

জোড়াখুনের দায়ে গ্রেপ্তার হয়েও রত্নাকরের বিশেষ ভাবান্তর দেখা যায়নি, জগদীশের ক্ষোভ দেখে সে সশব্দে হেসে ওঠে। পাগল হলে দাদা—কীসের ফাঁসি ? ফাঁসি দেওয়া অমনি মুখের কথা ! কত তদন্ত কত কাণ্ডকারখানা হল, পুলিশ চার্জশিট দিতে পারেনি। এই ভদ্দরলোকের কারসাজিতে আবার জড়ালেই ফাঁসি হয়ে যাবে ? দ্যাখো না ক-দিন লাগে তোমার ভাইটির ফিরে আসতে !

জগদীশ আক্ষেপ করে বলে, তাই বলো ! ও সব চুকে যাবার পরে তুই ভবঘুরে হয়েছিলি !

রত্নাকর হাসে, তবে কী ? ফাঁসি যাবার সুযোগ পেলে ছাড়তাম নাকি ? আমি নিজে পুলিশকে হেলপ করেছি—তবু প্রমাণ খাড়া করতে পারিনি। মরবে জেনে দুজনে যদি পরামর্শ করে এমনভাবে মরে যে কেউ বিশ্বাস করবে না তাদের খুন করা হয়েছে, খুনির মুখের কথা কেউ শোনে ? বেশি জিদ করতে পাগল বলে ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা হয়।

দত্ত প্রশ্ন করে, নাম ভাঁড়িয়েছেন কেন ?

ভাঁড়াব না ? খুনে বলে চাদ্দিকে নাম ছড়িয়ে ছেড়ে দেবেন—ও নাম নিয়ে আমি যাই কোথা !

অনেকের কাছে বলেন কেন খুন করেছেন ?

খুন করেছি বলেই বলি। অনেকের কাছে নয়, দু-চারজনের কাছে।

জগদীশ জলধির দিকে চেয়ে বলে, বিকারটা সারিয়ে নাও না জলধি ? চিকিৎসা করলেই তোমার মনের ব্যারাম সেরে যাবে। নিজেও সুখী হবে, তোমার স্ত্রীর জীবনটাও নষ্ট হবে না।

জলধি বলে, কী বকছেন পাগলের মতো ? আমার মনের কোনো রোগ নেই।

জগদীশ নিশ্বাস ফেলে বলে, তা বটে। তোমার মতো রোগীরা যদি জানত নিজের রোগ আছে, তাহলে তো রোগটাই সেরে যেত !

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রতাপকে ডেকে জগদীশ বলে, একটা দায় নাও। একটা কাজের কাজ করো। আটচালাটা তুলে দিয়ে তুমিই আমায় এদিকে ঝুঁকিয়েছ। আটচালায় চলবে না। আমি এখানে মস্ত হাসপাতাল গড়ব—মনের রোগীর হাসপাতাল। পাগলের হাসপাতাল শহরেই আছে, এখানে করব মানসিক রোগের হাসপাতাল।

প্রতাপ বলে, হাসপাতাল !

হাসপাতাল কথাটা পছন্দ না হয়—নাম দিয়ো চিকিৎসাকেন্দ্র, আরোগ্য নিকেতন—কিংবা শুধু সংশোধন !

প্রতাপ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ওটাই খাশা নাম হবে—সংশোধন ! জগদীশ বলে, তোমার বিষয়বুদ্ধি পাকা—তুমি পারবে। অ্যাদ্দিন যারা বেআইনি ভোগ-দখল করছে তাদের খাজনা সুদ ভাড়া এ সব মাপ করেও শুধু জমি তালুক বাড়ি বেচেই লাখের মতো ন্যায্য পাওনা হয়। হাজার পঞ্চাশ ষাটের মতো লগ্নি করা আছে। লাখ দেড়েকের মতো বিমা আছে—পাকা।

কদ্দিন প্রিমিয়াম বন্ধ ?

যদ্দিন তোমাদের এখানে আছি ! মা-র হাজার ত্রিশেক টাকার গয়না বন্ধক আছে, সুদটা নিয়ে একটু যদি মারামারি করতে পার প্রতাপ—

প্রতাপ সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাংকের সুদ না মহাজনের সুদ ? মহাজনের সুদের হিসাবে দিয়ে থাকলে অ্যাদ্দিনে গয়নার দামের চার-পাঁচগুণ পাওনা হয়ে গেছে মহাজনদের।

জগদীশ হেসে বলে, ব্যাংকেই বাঁধা আছে। বললাম না লগ্নিতে অনেক হাজার ছড়ানো আছে ? বাবা ছিলেন জমিদার, আড়তদার মহাজন—বাবার ছেলে আমাকে তুমি এতই বোকা ভেবেছ যে মায়ের গয়না বাঁধা দিতে মহাজনের কাছে যাব ! হঠাৎ বিপদে পড়ে দিশেহারা হয়ে টাকায় মাসে দু-পয়সা সুদ দিতে রাজি হয়ে কত লোক সুদও দিতে পারে না, গয়নাও ছাড়াতে পারে না,—এ সব কি আমার অজানা প্রতাপ ? ছেলেবেলা থেকে বাবা আমাকে এ সব হিসাবনিকাশ বিচারবুদ্ধি শেখাননি ?

প্রতাপ গদগদ হয়ে বলে, সব দিকে সব হিসাব না জেনে বুঝেই কি তুমি দেবতা হয়েছ বাবা ! মহাজন মাসে টাকায় দু-পয়সা সুদ নেয় তাও তোমার জানা !

খানিকক্ষণ এলোমেলো কথা চলে। জগদীশ নিজেই এলোমেলো কথার পালা শুরু করে। প্রতাপকে একটু ভাবতে দিতে হবে বইকী, হিসাবনিকাশ কষে দায় ঘাড়ে নিয়ে লাভ কী হবে লোকসান কী হবে একটু সমঝে দেখার সুযোগ না দিলে চলবে কেন ?

ভক্তি করে বলেই তো বিপাকে ফেলা যায় না প্রতাপকে।

জগদীশ বুঝিয়ে বলে, দেড়-দুলাখ টাকার দায় চাপাচ্ছি—লাভের হিসাব ভুলে যাও প্রতাপ। লাভ তোমার হবে। আমার যত হাজার টাকা উদ্ধার করবে, হাজারে তোমার একশো বখরা।

মুখের গোমড়া ভাব কাটে না প্রতাপের।

হাজারে একশো ?

ললিতা উঠে এসে প্রতাপের কানে কানে কী বলে সেটা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না জগদীশের।

হাজারে একশো কি কম হল ? টেন পার্সেন্ট ! ভালো কাজের জন্য টাকা তোলাচ্ছি, ভোগের জন্য নয়। রাজি হয়ে যাও, আপত্তি কোরো না।

প্রতাপ মরিয়া হয়ে বলে, যাক হাজারে একশো পঁচিশ করে দাও, দ্যাখো, দায়টা আমি কেমন পালন করি !

বেশ তো, তাই নিয়ো। দায় যে কঠিন আমি জানি। দেড় লাখ যদি আদায় করতে পারো, হাজারে একশো পঁচিশ তো পাবেই, মোট হিসাবে দশ হাজাব বেশি পাবে।

গভীর রাত্রে ঘুম আসতে শুরু করার সময় রত্নাকর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, দায়টা আমায় দিলেই হত ?

তুই পারবি না। তোর বিষয়বুদ্ধি নেই।

ন্যায্য পাওনা তো তোমার ? করতাম নয় মরতাম—তোমার ন্যায্য পাওনা আদায় করে আনতাম।

জগদীশ হাসে।—মরেও পারতিস না রে, এতকাল ঢিল দিয়ে পাওনা আদায় করা অত সহজ নয়। মরণপণ করে লেগে গেলাম আর অন্যের খপ্পরে যাওয়া ন্যায্য পাওনা পেয়ে গেলাম, সংসারে অত ন্যায় খাটলে ভাবনা ছিল নাকি ? তুই মরলে এ জগতে কার কী এসে যায় ? এ জগতের কার সস্তা দায়টা তুই ঘাড়ে নিয়েছিস ? তোর বাহাদুরি তো সব দায় এড়িয়ে চলা, আমার কাছে ধন্না দেওয়া !

পরদিন প্রতাপ প্রায় সপরিবারে হাজির হয়।

বলে, দায় নিলাম।

বিরক্ত জগদীশ কথা বলে না।

ফোকলা মুখে একগাল হেসে প্রতাপ বলে, না না সে জন্য আসিনি। বুঝিয়ে দিতে এলাম যে দাযটা সত্যি নিয়েছি। সংসারের সকলের ঘাড়ে দায় চাপিয়েছি। বুঝিয়ে দিয়েছি—এ দায় যদি না উদ্ধার করতে পারে চুলোয় দেব ঘরসংসার !

দায় নিয়ে তোমার কাজ নেই প্রতাপ !

প্রতাপ তো ছেলেমানুষ নয় ! সে চুপ করে থাকে। প্রায় তার সমগ্র পরিবারটি একে একে জগদীশের পায়ে মাথা নত করে প্রণাম করে সরে যায়।

প্রতাপ ধীর গম্ভীরভাবে বলে, রাগের কারণটা বুঝেছি বাবা, কিন্তু কী করব উপায় নেই। যে কাজ যত কম খরচে উদ্ধার করতে পারি—এটা একেবারে ধাত দাঁড়িয়ে গেছে। অন্যভাবে তো পারব না, ভেতরে জোর পাব না। তুমি আমার কিপটেপানা সারিয়ে দিয়েছ, সত্যি দিয়েছ। সকলকে ভোগে বঞ্চিত করে টাকা জমানোর ব্যারামটা সারিযে দিয়েছ কিন্তু বিষয়কর্ম চালাবার ধাতটা তো বদল করে দাওনি—অন্য কাযদায় পারব কেন ?

জগদীশ এবার হাসিমুখে বলে, তুমি আমায় হার মানালে প্রতাপ। ঠিক কথা, তোমার কায়দায় তোমার বিষয়বুদ্ধি খাটিয়ে আমার টাকা উদ্ধার করতে পারবে বলেই তো তোমায় দিয়েছি। তুমি লাভটা বড়ো করে দেখছ ভেবে রাগ হয়েছিল। প্রতাপ হেসে বলে, তোমার কাজ উদ্ধার করে দিয়ে সত্যি কি আর লাভ করব বাবা ? অত বড়ো পাষণ্ড কি আর আমায় তুমি রেখেছ ? আমি যা পাব সব তোমারই হাসপাতালের ফান্ডে জমা দেব।

সন্ধ্যাবেলা রত্নাকর বলে, প্রতাপ তোমার কেমন ভক্ত দাদা ? তোমার টাকাকড়ি উদ্ধার করে দিয়ে লাভ মারতে চায় ? হাজারে একশো লাভে খুশি নয়, তোমার সঙ্গে দরাদরি করে একশো পঁচিশ বাগিয়ে নিল !

তুই বুঝবি নে। বললাম না তোর বিষয়বুদ্ধি নেই। আমার টাকায় ভাগ বসিয়ে প্রতাপ লাভ করবে না—সে সাহস ওর নেই। প্রতাপ হিসাব করছে আমি অন্যদিকে অন্যভাবে ওকে কত লাভ পাইয়ে দেব—ছেলেমেয়েদের আনুগত্য পাইয়ে দেব, সম্মান পাইয়ে দেব। আমার টাকায় লাভ মারলে ভয়ানক পাপ হবে না ওর !

কমিশন আদায় করছে কেন তবে ?

লোকসান ঠেকাতে। প্রতাপ কি আর নিজে ছুটোছুটি করবে টাকাপয়সা বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ? কাজ করিয়ে নেবে অন্যকে দিয়ে, নিজে শুধু হাল ধরে থাকবে, চাল মারবে, কৌশল খাটাবে। তাতে তো খরচ আছে। তাই একটু মার্জিন রেখে হাজার করা পঁচিশ টাকা আবদার ধরে আদায় করে নিয়েছে।

ধরো যদি হিসেবের চেয়ে বেশি আদায় হয় ? তোমরা দুজনে হিসাবপত্র করে লাখ দেড়েকের আশা ছেড়ে দিয়েছ। যদি ওর একটা মোটা অংশ আদায় হয় ? নাম তো তোমার কম ছড়ায়নি দাদা, প্রতাপ সেটা কাজে লাগাবেই। তোমার মতো সাধুসন্ন্যাসী মহাপুরুষের টাকা মেরে দিয়েছে জানতে পারলে দশজনে কী রকম ছিছি করবে, ভবিষ্যতে কী রকম মুশকিলে পড়বে, এ সব তো বলবেই। তাছাড়া, পাপের ভয়ও দেখাবে। অন্যের ঘাড় ভেঙে হজম করা যায়—তোমার টাকা কি হজম হবে ? তোমার কি সহজ ক্ষমতা ? পারমিট-ফারমিট জোগাড় করেও লাভের ভরা জাহাজ তোমার শাপেই হয়তো ভরাডুবি হয়ে যাবে মাঝ-দরিয়ায় !

জগদীশ সশব্দে হেসে ওঠে।

বারবার বোঝালাম না তাকে, তোর বিচারবুদ্ধি আছে, বিষয়বুদ্ধি নেই। প্রথম যুক্তিটা বেশ খাড়া করলি, প্রতাপ আমার নাম নিয়ে কৌশল খাটাবে ! কিন্তু আমি গোসা করে শাপ দিলে ভগবান ওদের লাভের জাহাজ মাঝ-দরিয়ায় ডুবিয়ে দেবে—এ কৌশল প্রতাপ খাটাবে না। এ কথা বলেই তুই প্রমাণ দিলি তোর বিষয়বুদ্ধি নেই।

রত্নাকরকে কখনও রাগতে দ্যাখেনি জগদীশ। তার ভাবভঙ্গি কথাবার্তা থেকেই টের পাওয়া যায় সে ভীষণ চটে গেছে !

জগদীশের পায়ের কাছে কয়েকবার মেঝেতে মাথা ঠোকে। যোগাসনে বসার মতো মেরুদণ্ড সিধা করে বসে বুনো কার্পাসি চটের শার্টের তলাটা তুলে মুখ মোছে।

পৃথিবীর গায়ে জড়ানো মোটে মাইল পাঁচেকের মতো যে বায়ুস্তর আছে তার সবটা এক নিশ্বাসে শুষে নেবার মতো গভীর একটা নিশ্বাস ছাড়ে।

বলে বুঝিয়ে বলো দাদা। বাপ বলিনি, দাদা বলেছি তো ! কী বললে ছোটোভাইটিকে বুঝিয়ে বলো।

জগদীশ স্নেহের দৃষ্টিতেই তার দিকে চেয়ে থাকে। তার মুখের হাসিখুশি ভাবের এতটুকু পরিবর্তন ঘটে না।

রত্নাকর মরিয়া হয়ে বলে, আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। বিনে মাইনের আশ্রমের ম্যানেজার, হেডক্লার্ক, স্টোরকিপার, ক্যাশিয়ার গেটকিপার—সব পোস্টে খাটিয়ে নিচ্ছ। আসল কাজের বেলা আমায় বাদ দিয়ে প্রতাপকে খাতির করা কেন ? আমি কি ভেসে এসেছি ?

ভেসে আসিসনি ? সাত-আটবছর এদিক-ওদিক ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ঠেকিসনি ? কী করে তোকে বোঝাব বল ! তুই কি বুঝতে চাইছিস ! সুদর্শনা উশকে দিয়েছে, তুই আবদার ধরেছিস, জিদ করছিস।

রত্নাকর একটু নুয়ে যায়।

সত্যি সত্যি সর্বজ্ঞ হয়ে গেছ নাকি ?

সর্বজ্ঞ হতে হয় ? চোখের সামনে দেখছি না তোদের ব্যাপার-স্যাপার ?

জগদীশ হাসে।

ছিলি ভবঘুরে, হয়েছিস আমার কুঁড়েঘর আর আটচালাটার দারোয়ান। দুজনে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে সাহস পাচ্ছিস না—কেবলই হিসেবনিকেশ ঝগড়া আর পরামর্শ চালিয়ে যাচ্ছিস !

রত্নাকর খানিক চুপ করে থেকে সোজাসুজি অবুঝ আবদারের সুরেই বলে, কাজটা সোজাসুজি আমায় দিলে দোষ কী হয়, সোজা করে বুঝিয়ে দাও না ! লেখাপড়া শিখেছি, কবিতার বই লিখেছি, বোকাহাবা তো নই !

জগদীশ এবার গম্ভীর হয়ে বলে, তবু তুই পারবি না। প্রতাপ যেখানে কায়দা করে প্যাঁচ কষে চাপ দিয়ে ভয় দেখিয়ে লোভ দেখিয়ে কাজ আদায় করবে—তুই সেখানে সোজাসুজি তেতে গিয়ে বলবি—কই গো, জগদীশবাবুর ন্যায্য পাওনাটা উগরে দাও, নইলে খুন করব ! আঁটঘাট বেঁধে প্রতাপের আদায় করতে নামার রকম দেখেই সবাই টের পাবে—একেবারে ঘুঘু লোক, ওর সঙ্গে ইয়ার্কি চলবে না। একটা আপস করবে। জানিস না বুঝিস না, কোনোদিন ছ্যাঁচড়ামির ধার ধারিসনি—এ কাজ কি তোকে দিয়ে হয় রে রতন ?

রত্নাকর মুখভার করে চুপচাপ বসে থাকে।

জগদীশ হেসে বলে, ভাবিস কেন ? এতবড়ো একটা মহাপুরুষের লেজ ধরেছিস, তোদের একটা গতি হবে না ? প্রতাপ ওদিকে আমার টাকাপয়সা উদ্ধার করুক, তুই এদিকে আদায়পত্র বাড়া, চাঁদা তুলতে শুরু কর–

হাসিমুখে হালকা সুরে বললেও টের পাওয়া যায় জগদীশ তামাশা করছে না।

চাঁদা ?

চাঁদা। একটা ফান্ড খুলে কোমর বেঁধে চাঁদা তুলতে লাগতে হবে। একটা সত্যিকারের আশ্রম করব--মানসিক রোগের চিকিৎসার আশ্রম। পাকাবাড়ি হবে, ডাক্তার থাকবে, নার্স থাকবে—

রত্নাকর পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে।

জগদীশ বলে, ভাবলাম কী জানিস ? আমি যদি এলোমেলোভাবে কথা বলে ব্যক্তিত্ব খাটিয়ে ভাঙা মনে জোড়াতালি দিতে পেরে থাকি, তোর মতো ডবল খুনে ভাবুক ভবঘুরের প্রাণের জ্বালা জুড়িয়ে আবার সংসারি করতে পেরে থাকি,—দু-একজন ডাক্তারের সঙ্গে মিলেমিশে নিয়মমতো চেষ্টা করলে কত বিগড়ানো মনকে শুধরে দিতে পারব !

রত্নাকর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, এই জন্য টাকাকড়ি উদ্ধারের সাধ জেগেছে ! আমি ভাবছিলাম—

জগদীশ বলে, আমিও ভাবছিলাম তোরা কী ভাবছিস—কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করিস না কেন ! এদিকে জিজ্ঞাসার অন্ত নাই—হঠাৎ আমার দেড় লাখ দু-লাখ টাকার দরকার পড়ল কেন, কারও মনে সে প্রশ্ন জাগল না ?

আজকাল প্রায় রোজই রত্নাকরের সঙ্গে সুদর্শনার তর্ক আর ঝগড়ায় খণ্ডযুদ্ধ বাধছিল।

অন্যেরা উপস্থিত থাকলে কোনো বিষয়ে খানিকটা কথা কাটাকাটি হয়ে যায়, তার বেশি গড়ায় না। জগদীশ এবং আশ্রমের যারা ঘরোয়া লোক হয়ে গেছে তাদের সামনে তর্ক শুরু হলেই সেটা দাঁড়াচ্ছিল কথার যুদ্ধে।

হঠাৎ দেখা যায়, তর্ক তাদের বাধছে ঠিকমতোই কিন্তু সেটা ঝগড়ায় পরিণত হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

আপসে নয়—দুজনে যেন মিলেমিশে তর্ক করে পরস্পরকে আরও ভালো করে বুঝবার প্রয়োজনে।

জগদীশ বলে, ব্যাপার কী রে ? হাসপাতালের টাকায় মোটা ভাগ বসাবার মতলব আঁটছিস নাকি ? দেড়লাখ দু-লাখের ব্যাপারে নামছি, তোদের হিল্লে হবে বলেছি—অমনি বুঝি ঠাউরে নিয়েছিস রাজারানির হালে থাকার হিল্লে হল ?

রত্নাকর মুখ খুলতে যাবে, সুদর্শনা ধমক দিয়ে বলে, চুপ !

হেসে জগদীশকে বলে, যেমনভাবেই বলুন, আমরা আর চটব না। আমরা বুঝে গিয়েছি। আমরা আপনাকে সাধু মনে করি ভাবেন বুঝি ? কোনোদিন ভাবিনি। শুধু কথা বলতেন, তেমন যেন ভালো লাগত না। যেমন হোক কাজে নামছেন, আমরা অমনি মজা পেয়েছি। দুজনে কোমর বেঁধে খাটব,—কে কী করব পরামর্শ করছি কি না, তাই আর ঝগড়া হচ্ছে না।

জগদীশ হাত বাড়িয়ে সুদর্শনার গালটা টিপে দেয়।

এত উপদেশ না ঝেড়ে আরাম-বিলাস চাইবি না বললেই চুকে যেত।

গাল-টেপা হাতটাকে সরে যেতে না দিয়ে দুহাতে চেপে ধরে রেখে ছোটো মেয়ের মতোই ঠোঁট ফুলিয়ে সুদর্শনা বলে, আরাম-বিলাস চাইব না মানে ? নিশ্চয় চাইব। আরাম-বিলাসের ব্যবস্থা ছাড়া নিজেদের সভ্য মানুষ ভাবব কী করে ? শুধু রাজা-মহারাজারাই আরাম-বিলাস ভোগ করবে, আমরা ভেসে এসেছি ? তবে তোমার কাজ যদ্দিন না উদ্ধার হয় তদ্দিন আমরা নেংটি পরে ইলুবীজ খেয়ে দিন কাটাতে রাজি আছি। জগদীশ রত্নাকরের দিকে তাকায়। হাত তার বন্দী হয়ে আছে মেয়ের মতো সুদর্শনার দুটি পেলব মেয়েলি হাতের মুঠোয়।

রত্নাকর বলে, সামলে দেব, কাজ হবে, ভেবো না। কতগুলি নিয়ম চালু করতে হবে। সে সব আমরা ঠিক করে নেব, তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমাকেও কিন্তু মানতে হবে আমাদের নিয়ম।

কিছু কিছু নিয়মও চালু হয়েছে রত্নাকর ও সুদর্শনার চেষ্টায়। আগে ছিল শুধু একটা নিয়ম—সন্ধ্যার সময় জগদীশ নেশা শুরু করলে জিরাই তাপ্পি রত্নাকরেরা ক-জন ছাড়া অন্য কারও জগদীশের কাছে যাওয়া ছিল বারণ।

এখন দুপুরে জগদীশের খাবার পর (ভক্তেরা বলে ভোগ) দু-ঘণ্টা জগদীশের বিশ্রামের সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

আশ্রমের ঘরোয়া মানুষ ছাড়া কেউ কাছে যেতে পারবে না জগদীশের।

এখানে বাস করার প্রথম অনুমতি জুটেছিল রত্নাকরের। যখন খুশি আসার এবং জগদীশের কাছে যতক্ষণ খুশি বসার অধিকার জুটেছে সুদর্শনার।

অন্য ভক্ত অসময়ে এলে জগদীশ রেগে গিয়ে বলে, সারা সকাল বকবক করেছি, আরও বকাতে চাও ? চারদিকে ঘুরে প্রকৃতির শোভা দর্শন করো না বাবু, তৃপ্তি পাবে। আমায় দর্শন করে একফোঁটাও পুণ্য হবে না।

রত্নাকর বলে, প্রতাপ ও দিকে টাকাগুলো উদ্ধার করে আনছে, চাঁদাও উঠছে মন্দ নয়। প্রণামির টাকা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে ?

না, আর বিলোব না। এলোমেলো ভিক্ষা দিয়ে ক-টা গরিবের দুঃখ দূর করব ? তার চেয়ে দশটা প্রাণের জ্বালা জুড়িয়ে, লোকের এত দারিদ্র্য কেন বুঝিয়ে দিলে, কীসে মানুষের দুঃখ-দারিদ্র কমবে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিলে ঢের বেশি কাজের কাজ হবে !

কাজের কাজ !

কাজের কাজে জগদীশের মন ঝুঁকেছে !

কোথায় স্থাপন করা হবে জগদীশের আশ্রম—মানসিক ব্যাধির হাসপাতাল ? এখানে ? এই বনের ধারে বুনোদের গাঁয়ে ? না, আশ্রম হবে লোকালয়ে, শহরের কাছে।

শহরের কাছে শান্ত নির্জন স্থানে জমি কিনে যেদিন ভিত্তিস্থাপনের উৎসব হল সেদিন সন্ধ্যায় ভক্তদের বুক ভয়ে কাঁপিয়ে দিয়ে কী কাণ্ডটাই যে জগদীশ করল !

নতুন কেনা জমিতে তিনটি কুঁড়ে তোলা হয়েছে—পরদিন জগদীশ বনের মায়া প্রপাতের মায়া কাটিয়ে বিদায় নিয়ে ওখানে চলে যাবে, জিরাই তাপ্পিরা কয়েকজন সঙ্গে যাবে।

কয়েকজন ভক্ত আজ রাত্রে এখানে থাকার অনুমতি পেয়েছে।

আগের দিন জগদীশ নেশা করেনি। মাঝরাত্রি পর্যন্ত ছটফট করে ভাঙা ভাঙা একটা তন্দ্রার মধ্যে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিল।

রত্নাকর দ্বিধার সঙ্গে বলেছিল, এ রকম হঠাৎ বন্ধ করলে দাদা ?

হঠাৎ বন্ধ না করলে এ সব বন্ধ করা যায় ?

বিকাল থেকেই জগদীশের যেন কেমন কেমন ভাব। সন্ধ্যার পর হঠাৎ একসময়—সাপ ! সাপ !—বলে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠে ভয়ে দিশেহারার মতো সে কাঁপতে আরম্ভ করে।

দেখা যায়, তার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। তারপর শুরু হয় তার আবোল-তাবোল কথা, এলোমেলো চিৎকার আর ছটফটানি। ঠিক জ্বর-বিকারের রোগীর মতো করতে থাকে।

সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় মরণের আতঙ্কটা ! আশেপাশের ভক্তরাই নাকি তাকে খুন করার মতলব এঁটেছে দা, কুড়াল, টাঙ্গি এ সব এনেছে তাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলার জন্য !

সুদর্শনা গায়ে হাত দিয়ে বলে, গা তো ঠান্ডা !

প্রতাপ বলে, ডাক্তার আনা উচিত।

প্রতাপের গাড়ি ডাক্তার আনতে শহরে ছুটে যায়, রত্নাকর জগদীশকে বলে, একটু খাবে ? বিলাতি একটু খাও না।

জগদীশ কাতরভাবে বলে, না না, মরে যাব। কে যেন বোতলটার মধ্যে বড়ো বড়ো কাঁকড়া বিছে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমায় মারতে চায়।

ডাক্তার আসে। পরীক্ষা করে, বলে, ডিলিরিয়াম ট্রেমেন্স। বেশি ড্রিঙ্ক করলে হয়, হঠাৎ ড্রিঙ্ক বন্ধ করলেও এ রকম হয়।

পরদিন জগদীশ বলে, তোমরা কাজকর্ম চালিয়ে যাও—আমি কিছুদিনের জন্য ছুটি নিলাম। বিষ খাওয়া রোগটা সারিয়ে ফিরে আসব। এ এমন বিষ ! খেলেও কাবু করে, মনের জোরে খাওয়া বন্ধ করলেও কাবু করে !

কোথায় যাবে জগদীশ ?

হাসপাতালে যাব। মনের জোরের টোটকা চিকিৎসা বুঝি না আমি। ডাক্তার যা বলবে, যা করবে।

জগদীশ প্রশান্তভাবে হাসে।

সবাই প্রমাণ দেখলে তো, আমি যোগী নই, সিদ্ধপুরুষও নই। নইলে মদ ছাড়তে হাসপাতালে যেতে হয় !

ললিতা হাসিমুখে বলে, আমরা বুঝি জানি না ভেবেছেন বাবা ? আমার অমন রোগটা সারিয়ে দিলেন, ইচ্ছা করলে ও সব আপনি ছাড়তে পারেন না ! আসলে নিজের জন্য আপনি বিশেষ শক্তি খাটাবেন না—দশজনের মতো চলবেন। আপনি আমাদের শেখাচ্ছেন।

সকলে হাসিমুখে চেয়ে থাকে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির একটি পৃষ্ঠার অংশ